ইসলামী ব্যাংকিং

এপ্রিল ২০১৫

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

Islami Banking
April 2015
A Journal
Published by Public Relations Division
Islami Bank Bangladesh Limited

জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক
প্রধান কার্যালয় : ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার
৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ডিজাইন : নাহিদ প্রিন্টিং এ্যান্ড ডিজাইন স্টুডিও
মুদ্রণ : এভারগ্রীন প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

নিকো পি সোয়ার্জ ও অন্যান্য
সুদ প্রহেলিকা : ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নৈতিক আবেদন ৭

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা
সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং ২৮

আবু ওমর ফারুক আহমেদ এবং এম কবির হাসান
রিবা ও ইসলামী ব্যাংকিং ৫৮

এরদেম বাফরা
ইসলামী ব্যাংকিং : সময়ের অর্থমূল্য ও নিষিদ্ধ ‘রিবা’ ৯৩

আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব ও অন্যান্য
ইসলামী ও প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থা : তুলনামূলক আলোচনা ১০৭

ক্যামিলে পালদি
ইসলামী অর্থায়নে রিবা ও ঘারার ১২৩

সম্পাদকীয়

ইসলামী অর্থনীতির আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রিবা বা সুদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। আল-কুরআনের নির্দেশ হলো, 'অথচ আল্লাহ তা'আলা কেনাবেচা বৈধ করেছেন এবং সুদ করেছেন হারাম।' ইসলামের এ অবস্থান একটি স্বতন্ত্র আর্থসামাজিক দর্শনের নির্দেশক। যা অসম ও অন্যায় আর্থিক ব্যবস্থাসহ সবরকম সামাজিক শোষণকে ঘৃণা করে। 'রিবা'র বিলোপ শুধু আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসকেই বুঝায় না, বরং মৌলিকভাবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইসলামী আদর্শে পুনর্গঠন বুঝায়।

রিবার ব্যাপারে ইসলামের এই অবস্থান নতুন বা অদ্ভুত কোনো বিষয় নয়। প্রাচীন গ্রিক, রোমান ও ইহুদিয় ধারণার ইতিহাসে আমরা রিবার ওপর নিষেধাজ্ঞার অনেক উদাহরণ দেখি। ক্যাথলিক গির্জা ও ইহুদি ধর্মে সুদ গ্রহণের ব্যাপারে সদয় না হবার প্রশংসনীয় চর্চা ছিল। 'সুদ প্রহেলিকা : ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নৈতিক আবেদন' শীর্ষক নিবন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় সুদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন বতসোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক নিকো পি সোয়ার্জের নেতৃত্বে একদল গবেষক। তারা দেখান, বিশ্বব্যাপী সুদ বা ইউজারি লেনদেন বিস্তারে মূল ভূমিকা রাখে পুঁজিবাদ।

পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই সুদকে ঘৃণ্য বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতেও সুদ একটি বড় সমস্যা হিসেবে আলোচিত ও সমালোচিত। বর্তমান অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক অস্থিরতার মূলে রয়েছে সুদের কুপ্রভাব। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং যুগে যুগে শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদরা কেন সুদের বিরোধিতা করেছেন 'সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং' শীর্ষক নিবন্ধে তা তুলে ধরেছেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা।

রাসূল (স.) বিদায় হজের ভাষণে সব ধরনের 'রিবা' সম্পর্কে সাবধান করেছেন। আধুনিক কালে কেউ কেউ বলেন, আল-কুরআনে যে 'রিবা'র কথা বলা হয়েছে তা ইসলাম-পূর্ব যুগের সমাজে প্রচলিত একধরনের 'ধার' পদ্ধতি। তারা রিবা ও ইউজারির মধ্যে পার্থক্য এবং রিবার 'ব্যক্তিগত' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক' ধরন সৃষ্টি করেন। শরী'আহ্ বিধির পর্যাপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল শরী'আহ্ রিসার্চ অ্যাকাডেমি ফর ইসলামিক ফিন্যান্স (আইএসআরএ)-এর সিনিয়র গবেষক ড. আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও ইউনিভার্সিটি অব নিউ অর্লিন্স-এর অর্থনীতি ও অর্থায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এম কবির হাসান। 'রিবা ও ইসলামী ব্যাংকিং' শীর্ষক নিবন্ধে তারা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সহজাত সৌন্দর্য এবং ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলো তুলে ধরেন।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর উপাদান হলো রিবা। আল-কুরআন ইসলামী অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থা, এমন প্রতিষ্ঠান ও ধারণাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু এতে

সাধারণভাবে একটি ইসলামী সমাজের নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনৈতিক লেনদেনেরও নিন্দা জানানো হয়েছে। ইসলামী আইনের বিভিন্ন ধারায় (মাযহাব) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য এগুলোর ব্যাখ্যা জরুরি। 'ইসলামী ব্যাংকিং : সময়ের অর্থমূল্য ও নিষিদ্ধ রিবা' শীর্ষক নিবন্ধে তুরস্কের সাবেক বিচারপতি ড. এরদেম বাফরা এসব বিষয় সামনে নিয়ে এসেছেন।

শরী'আহ্‌র সুনির্দিষ্ট বিধানের আওতায় পরিচালিত হয় ইসলামী অর্থায়ন। যতই লাভজনক হোক না কেন শরী'আহ্‌বিরোধী তৎপরতায় কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করতে পারে না। বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক দুর্যোগের পর প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও এর নিয়ন্ত্রকরা। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী অর্থায়ন কিছুটা অগ্রসর হলেও বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব কতটুকু তা বিশ্লেষণ করেছেন মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি সাইন্স ইসলাম-এর গবেষক আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব এবং অন্যরা। 'ইসলামী ও প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থা : তুলনামূলক আলোচনা' শীর্ষক নিবন্ধে তারা সার্বিকভাবে ইসলামী অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য এবং এর গুরুত্ব পর্যালোচনা করেছেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে পণ্য এবং পণ্যের বিনিময়ে পণ্য কেনাবেচার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে অর্থ কেনাবেচার অনুমতি দেয়নি। কারণ, এর ফলে রিবা সৃষ্টি হয়। এটি নিষ্ঠুরতা, লোভ, অনৈতিকতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে। পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, অবিশ্বাস, অস্থিরতা ও অবক্ষয় সৃষ্টি করে সমাজকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। ফ্রাঙ্কো-আমেরিকান অ্যালায়েন্স ফর ইসলামিক ফিন্যান্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ক্যামিলে পালদির 'ইসলামী অর্থায়নে রিবা ও ঘারার' শীর্ষক নিবন্ধে এ বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

২০০৮ সালের সঙ্কট বিশ্ব অর্থনীতিতে নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। দেখা যায়, 'হাউজিং বুম'-এর সময় যে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে পরিচালনগতভাবে নিম্নমানের বলে তাচ্ছিল্য করা হয়েছিল, আর্থিক সঙ্কটকালে সেটিই ছিল প্রায় অক্ষত। হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ এ বিষয়ে 'ইসলামী ব্যাংকিং থেকে আর্থিক খাতের শিক্ষা' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে অর্থনীতির তিন বিশেষজ্ঞ আলবার্তো রিবেরা, ভেইট এটজোল্ড ও ফিলিপ ওয়াকারবেক প্রশ্ন রাখেন, প্রচলিত ব্যাংকগুলো যখন ক্ষতি পোষাতে নিজেদের ভাবধারা পুনর্বিন্যাস করছে তখন ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা কি তাদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে না?

'ইসলামী ব্যাংকিং' জার্নালের চলতি সংখ্যার নিবন্ধগুলো মূলত ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়নব্যবস্থার সবচেয়ে মৌলিক ইস্যু 'রিবা' বা 'সুদ' সম্পর্কিত। লেখাগুলো ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন শিল্পের চর্চা আরো গতিশীল এবং এই ব্যবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি আরো জোরদার করবে। গবেষক, প্রবন্ধকার, অনুবাদক ও পাঠকের প্রতি 'ইসলামী ব্যাংকিং' বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে আমাদের কাছে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করছি। তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ হবো। সার্বিক প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু ভুলত্রুটি লেখাগুলোতে থেকে গেছে। আমরা সবার সহৃদয় মার্জনা এবং মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ কামনা করছি।

সুদ প্রহেলিকা
ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নৈতিক আবেদন

নিকো পি সোয়ার্জ ও অন্যান্য[১]

সারমর্ম

ইসলামের নিয়ম একেবারে সহজ : আপনি যদি কোন ঋণ নিয়ে আগান বা কাউকে ধার দেন তাহলে কেবল আপনার মূলধনই ফেরত পাবেন, এর বেশি কিছু নয়। আর এর বাইরে লাভ পেতে চাইলে আপনাকে অংশীদারিত্বে যেতে হবে এবং উদ্যোগের অংশীদার হতে হবে। সুদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামের কোনো বিষয় এমন কিন্তু নয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব প্রাচীন গ্রিক, রোমান ও ইহুদীয় ধারণায় এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার অনেক উদাহরণ রয়েছে। ক্যাথলিক গির্জা ও ইহুদি ধর্মে সুদ গ্রহণের ব্যাপারে সদয় না হওয়ার প্রশংসনীয় চর্চা ছিল। তাদের প্রভাব কমে যাওয়ার পরে সুদ লেনদেন বৈধ করতে আইন প্রণয়ন করা হয়।

এর ফলে শিল্প, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণশক্তি বড় বড় পশ্চিমা করপোরেশনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং পরে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্য বিস্তার করে। এই অনুশীলন সুদ বা ইউজারি (usury) আরোপের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। হাজার বছর ধরে পশ্চিমা আইন ও নীতি সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করে। অবশ্য পশ্চিমা বা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয়ে লাভবান হতে পারেন এমন অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণে এটি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে, পুঁজিবাদ সুদ আরোপের মাধ্যমে বর্তমানে ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করার একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বব্যাপী যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা দূর করার ক্ষেত্রে একটি বিকল্প ব্যাংকিং বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবদান রাখতে পারে কি না তা পরীক্ষা করা এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এই বিকল্প ব্যাংকিং মডেল হবে সামাজিক ন্যায়বিচারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সব ধরনের আর্থিক শোষণ পরিহারের মূলনীতির ভিত্তিতে আবর্তিত হওয়ার ওপর জোর দিতে হবে। একই সাথে এর মূল লক্ষ্য যে সম্পদ সৃষ্টি আর দারিদ্র্য বিমোচন তা-ও তুলে ধরতে হবে।

১ **নিকো পি সোয়ার্জ** বতসোয়ানার রাজধানী গ্যাবরোনে বতসোয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক। মানবসমাজের নীতি-নৈতিকতা, মানবিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি তার গবেষণার অন্যতম বিষয়। এই গবেষণাপত্র রচনায় তাকে আরো সহায়তা করেছেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওডিরিল ওটো ইতুমেলেং, ওয়াংকি, আনিসা জিলাবদিন এবং আর. কুমার।

১. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণায় ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রিবার মূল অর্থ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

এতে রিবার অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিত এবং নীতিনির্ধারকদের মতকে সামনে রেখে একটি বৃহত্তর ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটের জন্য অনেকে যে রিবাকে অভিযুক্ত করছে, তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণায়।

এখানে পুঁজিবাদী তথা সুদ বা রিবাভিত্তিক অর্থনীতির একটি বিকল্প খোঁজা হয়েছে।

সবশেষে, রিবা ছাড়া মানুষ জীবনযাপন করতে পারে এমন কোনো বিকল্প আছে কি না, এ গবেষণায় তা-ও দেখা হয়েছে।

২. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ বা ইউজারির (রিবা) মূল অর্থ

২.১ গ্রিকদের ধারণা

আধুনিক সুদের মূল নাম হলো রিবা (ইউজারি) অর্থাৎ বিনিয়োগের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থপ্রাপ্তি; যা গ্রিক, রোমান ও ইহুদি রাব্বিদের ধারণা অনুসারে বোঝানো হতো। রিবা হলো সুদের ওপর সুদ গ্রহণ অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নেয়ার অনুসৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুসারে মূল অর্থের ওপর যে সুদ প্রাপ্য হবে তা অপরিশোধিত মূল ঋণের সাথে যুক্ত হয়ে প্রদেয় সুদাসল হিসেবে তার ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হিসাব হবে (দ্রষ্টব্য ১)। এ ধরনের সুদ বা রিবা নেয়াকে (যেকোনো সুদ বা নির্দিষ্ট হারের প্রাপ্তি) সুনীতির বিরুদ্ধে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় (দ্রষ্টব্য ২)।

গ্রিসে সুদ গ্রহণ বস্তুত জীবনের একটি অংশে পরিণত হয়েছিল। গ্রিক ইতিহাসজুড়ে এর বৈধতার স্বীকৃত ছিল, তবে একই সাথে এর বিরোধিতাও ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত, দেউলিয়া ঋণগ্রহীতারা তাদের ঋণদাতাদের কাছে দাস হিসেবে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধ্য হতো। ঋণদাতারা তাদের দাস হিসেবে বিক্রি এমনকি হত্যাও করতে পারত (দ্রষ্টব্য ৩)।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টট্ল রিবা অনুশীলন তথা সুদ লেনদেনের নিন্দা করেন। প্লেটো মনে করতেন টাকার নিজস্ব অন্তর্নিহিত কোনো শক্তি নেই এবং ঋণের ওপর নির্দিষ্ট লাভ গ্রহণ বেআইনি (দ্রষ্টব্য ৪)। আর অ্যারিস্টট্ল টাকাকে দেখতেন প্রয়োজনীয় শিল্প বা উপকরণ হিসেবে। তবে তার মতে যদি এটি জীবনসায়াহ্নে আসে, যদি এটি কোনো সীমা না মানে, যদি এটি তার অতি উচ্চাভিলাষ মেটানোর প্রকৃতিবিরুদ্ধ চর্চায় পরিণত হয়, তবে তা মানুষের কল্যাণকামিতার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। অ্যারিস্টট্ল টাকাকে দেখতেন বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এবং সুদের আকারে তা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে নয় (দ্রষ্টব্য ৫)।

ইউজারিগ্রহীতা বা সুদখোররা আসলে তাদের লোভের কারণে স্বভাবত নিষ্ফলা এবং একান্তই বিনিময় মাধ্যম টাকা থেকে লাভ তুলে নেয়ার চেষ্টা করে (দ্রষ্টব্য ৬)।

২.২ রোমান

জাস্টিনিয়ান (৪৮৩-৫৬৫ খ্রিষ্টপূর্ব) তার কর্পাস জুরিস (Corpus Juris) গ্রন্থে মূলধনের ওপর সুদ আরোপের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি করতে নিষেধ করেছেন (দ্রষ্টব্য ৭)। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৬ সালে থিউডোজিয়াস (Theodosius) ইউজারিগ্রহীতা বা সুদখোরদের ওপর অবৈধভাবে নেয়া সুদের জন্য এর চার গুণ জরিমানা আদায়ের ডিক্রি জারি করেন (দ্রষ্টব্য ৮)।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭ সালে রোমে একটি আইন করে সুদের হার কমানো হয়। ... সুদের হার অর্ধেক কাটা হয় (semiunciarum tantum ex unciario fenus factum) (দ্রষ্টব্য ৯)। একই ধরনের আইন 'লেক্স ফ্লুমিনিয়া মাইনাস সোলভেনডি'তে (Lex Fluminia minus solvendi) (২৭১ খ্রিষ্টপূর্ব) ঋণগ্রহীতাদের টাকার কমে যাওয়া মানের বিপরীতে তাদের ঋণ পরিশোধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। একই সাথে লেক্স ভেলেরিয়া দেউলিয়া ঋণগ্রহীতাদের অপরিশোধিত অর্থের এক-চতুর্থাংশ টাকা দিয়ে তাদের ঋণদাতাদের সন্তুষ্ট করার সুযোগ দেয় (দ্রষ্টব্য ১০)।

রোমানরা দীর্ঘ গ্রিক অনুশীলন অবলম্বনে ঋণের সুদের হার প্রতি মাসে এক শতাংশ (১২ শতাংশ এক বছরে) চালু করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫১ সালে এটি রোমে আইনসঙ্গতভাবে সুদের সর্বোচ্চ হার হয়ে ওঠে (দ্রষ্টব্য ১১)।

২.৩ ইহুদি যাজকদের (রাব্বি) ভাবনা

ওল্ড টেস্টামেন্ট বা তাউরাতের সময় অ-ইহুদিদের কাছ থেকে সুদ নেয়ার অনুমতি চালু রাখা হয়। এমনকি এ রকম কিছু কিছু আদেশও দেখা যায় যে, "তুমি বিদেশীদের ধার দিয়ে সুদ নিতে পারো, কিন্তু তোমরা একে অপরের কাছ থেকে ধার দিয়ে সুদ নিও না" (দ্রষ্টব্য-১২)। এই ব্যবস্থা অনুসারে ইহুদিরা বিদেশীদের কাছ থেকে ইউজারি বা সুদ নিতে পারত কিন্তু তাদের একজন অন্যজনের (ইহুদি ভাইয়ের) কাছ থেকে সুদ নিতে পারত না (দ্রষ্টব্য-১৩)।

সুদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আইনটি শুধু ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিজেদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। রাব্বি শিমিয়োন বেন ইলিজাস (Rabbi Simeon ben Eleazar)-এর অভিমত ছিল ভিন্ন। তিনি মত দেন, এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপ্তি বিদেশীদের ওপরও বিস্তৃত হওয়া উচিত। তিনি সে ব্যক্তির প্রশংসা করেন যিনি সুদ ছাড়া ধার দেন এবং যে ব্যক্তি তা করতে অস্বীকার করে তার নিন্দা করেন। তোশেফিয়া (Tosephia) থেকে বাবা মেজাই (Baba Mezi) পর্যন্ত উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যারা সুদ ছাড়া ধার দেন তাদের পুরস্কৃত করার ওয়াদা করা হয়েছে।

ফিলো (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০ থেকে ৪৫ অব্দে) যেকোনো ভাই বা বোনের কাছে (দেশের নাগরিক বা জাতিভুক্ত হোক বা না হোক) সুদের ভিত্তিতে ধার নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঋণকে উপহার হিসেবে গণ্য করেন, যা গ্রহীতা কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া তার যখন ভালো সময় আসবে তখন উৎফুল্লচিত্তে পরিশোধ করবে। তিনি দ্য ভারচুটিবাস (De Virtutibus) গ্রন্থে লিখেছেন, "মূলধনের সঙ্গে নিষিদ্ধ সুদের পরিবর্তে শুভেচ্ছা, প্রতিবেশীর প্রতি কল্যাণকামিতা, দাতব্য সহায়তা, মহানুভবতা, ভালো সুনাম এবং সুখ্যাতি পাবেন ঋণদাতা" (দ্রষ্টব্য ১৪)। একইভাবে মেকিলিহা (Mekiliha) এক্সোডাস (Exodus) গ্রন্থে ইউজারি বা সুদ গ্রহণকারী সব মানুষের নিন্দা করেছেন (দ্রষ্টব্য ১৫)।

সে সময় সুদ গ্রহণকে বিবেচনা করা হতো ঈশ্বরকে অস্বীকার করার সমতুল্য হিসেবে। ব্যাবিলনীয় তালমুদ (ইহুদিদের ধর্মীয় আইনের গ্রন্থ) গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (Gemara) রাব্বি জোসে বলেছেন, "আসুন এবং দেখুন সুদ নিয়ে যারা ধার দেয় তাদের অন্ধত্ব এমন ব্যক্তিরা ইসরাইলের ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছে। প্রায় একই ভাষায় জেরুসালেম তালমুদ-এ সুদ গ্রহণকে সদাপ্রভুকে অস্বীকারের নামান্তর বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ১৭)।

জেরুসালেম তালমুদ-এর লেখায় সুদকে মূর্তিপূজার পাপের সাথে তুলনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ১৮)। রাব্বিদের মত হলো, সুদ বা ইউজারি গ্রহণ রক্ত চুষে খাওয়ার সমতুল্য (দ্রষ্টব্য ১৯)। রাব্বিরা এটাও বলেছেন যে সুদ গ্রহণ মানে হলো নিজ কন্যাকে দাসত্বের জন্য বিক্রি করা। তালমুদের ব্যাখ্যা অনুসারে "[...] একজন মানুষের সুদে ধার নেয়ার চেয়ে তার মেয়ে বিক্রি করা ভালো" (দ্রষ্টব্য ২০)। রাব্বিরা ইউজারি বা সুদ (রিবা) গ্রহণকে ডাকাতির সমতুল্য বিবেচনা করে সুদগ্রহীতাদের সাক্ষ্য বা বিচারক হিসেবে নিয়োগ না করার কথা বলেছেন (দ্রষ্টব্য ২১)।

৩. অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ

৩.১ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্যুতি–সুদি লেনদেন বৈধকরণ

প্রাথমিকভাবে ইউজারি ও সুদের ওপর তিনটি প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল যা আগের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে তা থেকে বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর নির্দেশনায় একধরনের অর্থনৈতিক নমনীয়তা আসে, যার আওতায় সমসাময়িক আর্থিক লেনদেনে সুদ বা ইউজারি গ্রহণকে মেনে নেয়া হয়। খ্রিষ্টবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিভার নীতিগর্ভ রূপক হিসেবে বিবেচনা করে ক্রিসটো ব্যাংকের আমানতের সুদ সৃষ্টি করাকে শুধু স্বাভাবিক হিসেবেই গ্রহণ করেননি অধিকন্তু একে প্রশংসাযোগ্য বলেও অভিমত দেন (দ্রষ্টব্য ২২)।

এর ফলে, সুদ লেনদেনকে বৈধতা দিতে আইনের খসড়া তৈরি করা হয়। মধ্যযুগের ধর্মীয় চুক্তিগুলোতে ইউজারি নিষিদ্ধের ব্যতিক্রম অনুমোদন করা হয়, যেখানে ঋণদাতা তার মূলধনের

বেশি অর্থ ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে (দ্রষ্টব্য ২৩)। এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ী অথবা অন্য কাউকে টাকা ধার দেয় তিনি সে অর্থ কাজে লাগিয়ে লাভ করবেন আর ঋণদাতার সেখান থেকে লাভ গ্রহণ অন্যায্য হতে পারে না। এরপর ইউজারিকে বৈধ করতে মানবিক আইন তৈরি করা হয়। আর এর উদ্দেশ্য থাকে যে অনেক ব্যক্তির 'দরকারি' কর্মকাণ্ডে যাতে হস্তক্ষেপ না হয় (দ্রষ্টব্য ২৪)। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র (ধর্মীয়) অফিস থেকে ব্যবসায়ীদের লাভজনক বাণিজ্য থেকে সুদ গ্রহণ আইনত অনুমোদন দেয়া হয় (দ্রষ্টব্য ২৫)।

দুই ভিত্তিকে বিবেচনায় এনে খেলাপি ঋণগ্রহীতা থেকে ক্ষতিপূরণ পেতে ঋণদাতাদের অনুমতি দেয়া হয় এর একটি হলো দেনাদার নির্দিষ্ট দিনে ঋণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার যে ক্ষতি হবে তা ঋণের সাথে অবশ্যই যুক্ত করে দিতে হবে। এই অতিরিক্ত অর্থপ্রদানকে বলা হয় 'সুদ'। এ ছাড়া সুদের দাবি তখনো করা যেতে পারে যদি দেনাদার সময়মতো ঋণ ফিরে না পাওয়ার কারণে মুনাফা তৈরির কোনো সুযোগ হারায়। ঋণদাতা আইনত সুদ হিসেবে ইউজারি গ্রহণ করতে পারে (দ্রষ্টব্য ২৬)। উদাহরণস্বরূপ, পোয়েনা ডেতেনতরি (poena detentori) বা মোরা (mora) ঋণ পরিশোধে পরিপক্ব হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের পরে বিলম্বিত পরিশোধের জন্য জরিমানা আরোপ করেছেন। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে এখানে বিলম্বিত পরিশোধের জন্য সুদ গুনতে হবে মৌন সম্মতির ভিত্তিতে (in fraudem usurarum)।

দ্বিতীয় শিরোনাম ক্রমবর্ধমান ক্ষতি (damnum emergens) -ঋণদাতা ঋণ দেয়ার পর নিজের কোনো ধরনের নষ্ট বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ যেমন– ঋণ দেয়ায় জরুরিভাবে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কোনো অগ্নিকাণ্ড বা ঝড়ে শিশু বা গৃহপালিত পশু ধ্বংস হওয়া। তৃতীয় শিরোনাম হলো, লুকরাম সেসান্স (lucrum cessans), ঋণদাতার সুযোগের খরচ হিসেবে সুদের আকারে তা গ্রহণ করা। একে ঋণ এবং ঋণ পরিশোধে ফেরত প্রদেয় অর্থের মধ্যে বৈধ পার্থক্য হিসেবে দেখা হয়। এই শিরোনামে প্রধানত ফিরতি অর্থ প্রদত্ত ঋণের চেয়ে বেশি হওয়াকে যুক্তিযুক্ত করে। চূড়ান্ত শিরোনাম হলো ভেন্ডিটিও সাব ডুবিও (venditio sub dubio) – এটি হলো একটি নির্দিষ্ট ঋণ, যার আওতায় একটি বিক্রি চুক্তিতে ভবিষ্যতে পরিশোধের সুনির্দিষ্ট সময় থাকে। এই চুক্তিতে ঋণ অঙ্কে প্রয়োজনীয় সুদ যুক্ত হয়ে পরিশোধের ঋণাঙ্ক বেড়ে যায় (দ্রষ্টব্য ২৭)।

উদাহরণস্বরূপ, পণ্য একটি নির্দিষ্ট দিনে গৃহীত হলো এবং পরের কোনো সময়ে এ জন্য অর্থ প্রদান করা হলো। ঋণদাতা যেদিন পণ্য সরবরাহ করল সেদিনের দর আর যেদিন অর্থ পরিশোধ করল সেই অঙ্কের পার্থক্য হলো ঋণের কার্যকর সুদ। এ ধরনের চুক্তিতে অসাধুদের জন্য সুযোগ অপব্যবহারের অবাধ সুযোগ থাকে। আমার মতে, ঋণের সুদ বা ইউজারি যা হওয়া উচিত সেই স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি হতে পারে (দ্রষ্টব্য ২৮)।

অন্য একটি শিরোনাম হলো ত্রিপক্ষীয় চুক্তি (contractus trinus) তত্ত্ব। এতে ওপরের একই ধরনের মনোভাব পাওয়া যায়। এটি সুদের নামে ইউজারিকে বৈধতা দেয় (দ্রষ্টব্য ২৯)। কন্ট্রাকটাস ট্রিনাস বা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি তত্ত্ব ছিল মধ্যযুগে ইউজারির মাধ্যমে ইউরোপীয় বণিকদের ঋণ গ্রহণের বৈধতা দেয়ার একটি কৌশল। এটি ছিল তিনটি চুক্তির সংমিশ্রণ, যাতে প্রদত্ত টাকার একসাথে লাভের নির্দিষ্ট হার ঠিক করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, এক বছরের জন্য ব্যক্তি 'এ' ১০০ টাকা বিনিয়োগ করতে পারে ব্যক্তি 'বি'কে। ব্যক্তি 'বি' যেকোনো অঙ্কের লাভ করে সেটি আবার বিক্রি করে। এ লাভ মনে করা হলো ৩০ টাকা, 'ফি' হিসেবে ব্যক্তি 'বি' পরিশোধ করল ১৫ টাকা। অবশেষে, একটি তৃতীয় চুক্তির মাধ্যমে সম্পদের কোনো ক্ষতির বিপরীতে বীমা হিসেবে ব্যক্তি 'বি' ৫ টাকা খরচ দেবে 'এ'কে। এই তিনটি চুক্তির সাথে একযোগে একমত হওয়ার ফলে ব্যক্তি 'বি'-এর ১০০ টাকার একটি ঋণের সুদ ছিল ১০ টাকা (দ্রষ্টব্য ৩০)।

ইউজারি গ্রহণকে যুক্তিসিদ্ধ করার আইনটি নিম্নরূপ : অর্থ ঋণ দেয়ার সাথে একটি ঝুঁকি এবং সময়ের উপাদান যুক্ত থাকে। ঋণদাতা যে সময়ের জন্য ঋণ দেয় ওই সময়ে বিকল্প কোনো স্কিমে সে ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। তাই সুদ আরোপ করাই হতে পারে ঋণদাতার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য একমাত্র বিনিময়।

৩.২ ইহুদিবাদ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত অ-ইহুদিদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণের অনুমতি পাশ্চাত্যে সুদ গ্রহণের পদ্ধতি চালু হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর একজন সুপরিচিত ইহুদি আবারবানেল (Abarbanel) প্রথম পুঁজিবাদের একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব দেন। তিনি সুদ সম্পর্কে বলেন, 'মূল্যহীন কোনো কিছুই নেই। কারণ মানুষ টাকা খাটিয়ে তা থেকে লাভ করে (মদ এবং ভুট্টা উৎপাদন এবং অন্য কিছুর মাধ্যমে টাকা উপার্জন করতে পারে)। কেন ঋণদাতাকে সেই লাভের একটি অংশ সুদ হিসেবে দেবে না?'

...উদাহরণস্বরূপ, কেন একজন কৃষক, যার টাকায় গম চাষ করে বিপুল ফলন পেয়ে লাভবান হয় সে ব্যক্তি তার ১০ শতাংশ ঋণদাতাকে দিতে পারবে না? এই দেয়াটা না ঘৃণ্য, না ঘৃণিত কোনো বিষয়। এটি একটি সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সে লেনদেন সঠিক। দাতব্য অনুরোধে না হলে কাউকে লাভ ছাড়া অর্থ দিতে বাধ্য করা যায় না [...] (দ্রষ্টব্য ৩১)। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে, পুঁজির মালিককে তার ঋণের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়া যুক্তিযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয় (দ্রষ্টব্য ৩২)।

এমনকি ক্যাননিস্টরা (গির্জার আইনে বিশেষজ্ঞ, যারা সুদগ্রহণের বিরোধিতা করেছেন) বলেছেন, যেকেউ ঋণ নেয়ার জন্য ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি দিতে পারে। পোপ ষষ্ঠ আলেক্সান্ডার রাষ্ট্রের শাসকদের ইহুদিদের সুদ আরোপের অনুমতি দেয়ার বিষয়টি অনুমোদন করেন (দ্রষ্টব্য ৩৩)।

কেলভিনের মতে, শুধু ন্যায্যতা ও দাতব্যের পরিপন্থী হলে সুদ নিষিদ্ধ করা যায়, তা নাহলে সেটি ঠিকই আছে (sommes frères, voire sans aucune)। এই সূত্রটি অবশেষে পুঁজিবাদের নতুন উদ্দীপক হয়ে ওঠে (দ্রষ্টব্য ৩৪)।

ইহুদি ধর্মে ঋণের ইউজারি বা সুদ নেয়া সম্পর্কে এ ধারণা, আত্মপক্ষ সমর্থন ও পশ্চিমা ধর্মতত্ত্ববিদ (Scholastici) দ্বারা সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে উদার মতামত ইউজারি বা সুদ (রিবা) নিয়ে উভয় সঙ্কট সৃষ্টি করে।

৪. ইউজারি বা সুদের (রিবা) ব্যাপারে পণ্ডিতদের ঐকমত্য

ইউজারি বা সুদের (রিবা) ব্যাপারে অর্থনীতির পণ্ডিতদের মধ্যে সাধারণ ঐকমত্য হলো যা (ধার) দেয়া হয় তার চেয়ে কিছু বেশি গ্রহণ করা (দ্রষ্টব্য ৩৫)।

৪.১ সুদের সংজ্ঞা

ম্যাকলাফলিন বলেছেন উসুরা (usura) শব্দটি এসেছে উসু আয়েরা, উসু আয়েরিস, উসুয়েরা, উসুয়েরি, উসুরি বা উসু রেই (usu aera, usu aeris, usuera, usueri, usurea or usu rei) থেকে। এর মানে হলো পেসুনিয়া ও ইউজারি (pecunia and usury) শুধু টাকার ক্ষেত্রে নয় মানুষের প্রদত্ত যেকোনো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (দ্রষ্টব্য ৩৬)। ম্যাকলাফলিন ষষ্ঠ ইনোসেন্টের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যিনি বলেছেন, ইউজারি হলো এমন একটি লাভ যা একটি ঋণচুক্তি থেকে উৎসারিত হয় (দ্রষ্টব্য ৩৭)। এর আরো ব্যাপক একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হোস্টেনসিস (Hostiensis)। তিনি বলেছেন, যে ধরনের চুক্তি সম্পাদন হোক অথবা বাড়তি প্রাপ্তির উদ্দেশ্য যেমনই ব্যবস্থা থাকুক না কেন প্রদত্ত পুঁজি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত যা আসবে তা হলো ইউজারি বা সুদ। এমনকি কোনো চুক্তিই যদি না থাকে অথবা বাড়তি প্রাপ্তির কোনো উদ্দেশ্যও না থাকে এরপরও অতিরিক্ত পাওয়াটা হবে ইউজারি বা সুদ (দ্রষ্টব্য ৩৮)।

৪.২ মধ্যযুগে সুদের শিক্ষা

১১৪০ সালের পর গ্র্যাটিয়ান (Gratian) তার ডিকরেটাম (Decretum Gratianus) প্রণয়ন করেন। এতে গির্জার পুরনো সব আইন লিপিবদ্ধ করা হয়। ডিকরেটাম-এর ৪৬ ও ৪৭ অনুচ্ছেদে তিনি যাজকদের ইউজারি বা সুদ দাবি নিষিদ্ধ করেন এবং ইউজারি নেয়ার অপরাধে অপরাধী হলে তিনি কোনো আদেশ দিতে পারবেন না বলে শর্ত আরোপ করেন। আর এ ধরনের অপরাধী ইতোমধ্যে আদেশ দিলে তাকে পদচ্যুত করা হবে বলে জানান। গ্র্যাটিয়ান তার কনকর্ডিয়া ডিসকরড্যানিয়াম ক্যানোনাম (Concordia Discordantium Canonum) গ্রন্থে ইউজারি বা সুদের একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেন। এতে তিনি বলেন, “মূলধনের ওপরে

কিছু দাবি অথবা গ্রহণ বা প্রদত্ত ধারের চেয়ে বেশি কিছু পাবেন এমন আশা করলেও তা ইউজারি বা সুদ নেবার অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। টাকা বা অন্য কিছুতেও ইউজারি হতে পারে। যে ব্যক্তি ইউজারি গ্রহণ করে সে ব্যক্তি লুণ্ঠনের অপরাধে অপরাধী গণ্য হবেন এবং একজন চোরের মতো নিন্দনীয় হবেন; ইউজারির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সাধারণ ও যাজক সবার ওপর প্রযোজ্য। এই অপরাধে কোনো অপরাধী যাজক হলে তার শাস্তি হবে আরো গুরুতর (দ্রষ্টব্য ৩৯)।

ক্যাননিস্টদের অনুপ্রাণিত করেন গ্র্যাটিয়ান এবং এর ফলে তারা 'করপাস জুরিস ক্যানোনিসি' নামে একটি নথি সঙ্কলন করেন। এই নথিতে সুদ প্রশ্নে দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের দলিল এবং সুদ সম্পর্কিত সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয় (দ্রষ্টব্য ৪০)। এই সময়কালে যাজকরা ইউজারি সংশ্লিষ্ট সব সমস্যা, সব চুক্তি, ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং বাণিজ্যিক জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছু নথিতে অন্তর্ভুক্ত করেন যা ওই সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডারে পরিণত হয় (দ্রষ্টব্য ৪১)।

ম্যাকলাফলিন (McLaughlin) এর মতে, ১১৩৯-এর ল্যাটারান কাউন্সিল অনুযায়ী, ঐশ্বরিক এবং মানবিক উভয় আইনে ইউজারিভিত্তিক ঋণদাতার অর্থলিপ্সার ঘৃণ্য বিষয় পাওয়া গেছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ১৩১১-১৩১২ সালের কাউন্সিল অব ভিয়েন (Council of Vienne)-এ জোর দিয়ে বলা হয়, যেকোনো কমিউনিটির প্রধান কর্মকর্তা সুদ গ্রহণ বা গ্রহণের অনুমতি দেয়ার জন্য অভিযুক্ত হলে তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হবেন (দ্রষ্টব্য ৪২)। সুদের জন্য ধার প্রদান করা চুরির মতোই একটি অনৈতিক পাপ (দ্রষ্টব্য ৪৩)।

ম্যাকলাফলিন বলেছেন, ব্যালডাস (Baldus) তিন ধরনের সুদ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, কুয়ায়েডেম সান্ট উসুরায়ে পানিটরিয়ায়ে (quaedem sunt usurae punitoriae), কুয়ায়েডেম রিকমপেনসাটোরিয়ে (quaedem recompensatoriae) এবং কুয়ায়েডেম লুকরেটোরিয়ে (quaedem lucratoriae)। প্রথম ধরনটির ঐশ্বরিক অনুমোদন রয়েছে। যাজক লাউটো বিলম্বিত পরিশোধের জন্য সুদ দাবি করেছিলেন। দ্বিতীয় ধরনটির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত অনুমতি দেয়া হয়, জরিমানার পরিবর্তে বীমা আকারে বরং শুল্কের পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তা নেয়া যেতে পারে। এ ধরনের সুদ প্রাকৃতিকভাবে ন্যায্যতা বা ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ হয়। অন্যের মূল্যের বিনিময়ে একজন নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চাইতে পারেন না (দ্রষ্টব্য ৪৪)।

তৃতীয় ধরনটি ঐশ্বরিক আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয় (দ্রষ্টব্য ৪৫)। ম্যাকলাফলিন এই নিয়মের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, পাওনাদারকে ক্ষতির বিপরীতে দেনাদারের করা মুনাফা থেকে সুদ গ্রহণ অনুমোদন করা হয় (দ্রষ্টব্য ৪৬)। এখন প্রশ্ন হলো কেন বৃদ্ধিটা অনুমোদন করে ইউজারি নিষিদ্ধ করা হলো।

ব্যালডাস এর উত্তরে বলেছেন, দুটির উদ্দেশ্য ভিন্ন। তিনি উল্লেখ করেছেন, ইউজারির ক্ষেত্রে ঋণের হিসাবে অতিরিক্ত দাবি করা হয়, অন্য দিকে, সুদজনিত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাওনাদার তার ক্ষতির বিপরীতে দেনাদারের লাভ থেকে কিছু পেতে চান (দ্রষ্টব্য ৪৭)। ম্যাকলাফলিন যুক্তি দেখান ইউজারির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ দাঁড়ায় ঋণ হিসাবের লাভ বা লোকসানে। তার মতে, ঋণদাতা তার মূল পুঁজিও হারাতে পারেন (দ্রষ্টব্য ৪৮)।

গ্রেটিয়ানের ডিকরেটামে শুধু টাকা নয়, মদ বা তেলের মতো পণ্যের ক্ষেত্রেও দেয়া ধারের অতিরিক্ত যা হবে সে ধরনের ইউজারি গ্রহণের নিন্দা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ৪৯)। ম্যাকলাফলিন প্রদত্ত ইউজারির ব্যাখ্যা হলো '. . .যে ধার দেয়া হয় তার সমষ্টির চেয়ে বেশি প্রাপ্তি।" এটি একটি বাড়তি দাবি, যদিও এটি হতে পারে একটি ছোট উপহার (দ্রষ্টব্য ৫০)। তিনি বলতে চেয়েছেন, পুঁজির ওপর যা-ই যোগ করা হয়, তার নাম কী তা কোনো বিষয় নয় (দ্রষ্টব্য ৫১)। অথবা যখন অতিরিক্ত প্রয়োজন বোধ করা হয় আর তখন তা দেয়া হয় (৫২ দ্রষ্টব্য), আমরা সেটা পাই ইউজারি হিসেবে।

গ্রেটিয়ানের ডিকরেটামে যে নিন্দা করা হয়েছে তার মধ্যে ইউজারির উল্লেখও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যারা উচ্চমূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে কেনে, যারা কোনো লাভের জন্য ব্যবসায় যুক্ত হয় বা যারা যা দেয় তার চেয়ে বেশি পেতে চুক্তি করে তাদের কথা বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ৫৩)। ম্যাকলাফলিনের মত অনুযায়ী, নিম্নলিখিত চুক্তি ইউজারির মধ্যে পড়তে পারে : আমি আপনাকে যদি পাঁচ থেকে ছয় মাসের জন্য দশ পাউন্ড ধার দেই এবং বিশ পাউন্ড দাবি করি। আর এই চুক্তি ইউজারির মধ্যে পড়বে না যদি তা দিয়ে কেনা ঘোড়ার মূল্য এর সাথে যেটি বাড়তি যুক্ত করা হয়েছে তার যোগফলের চেয়ে বেশি হয়।

আরেকটি উদাহরণ, যদি একটি ২০ পাউন্ড দামের পণ্য একটি নির্দিষ্ট তারিখে ত্রিশ পাউন্ড মূল্যে বিক্রি করি তাহলে আমি ইউজারি নেয়ার জন্য দোষী হবো, যদি না সে সময় এর আনুমানিক মূল্য সমপরিমাণ হবে কি না সন্দেহ থাকে। এ ছাড়া আমি শস্য কিনতে এখন মূল্য দিতে পারি এবং যা ফসল কাটার সময় সরবরাহ পাওয়া যাবে। আর আমি এখন যে মূল্য দেবো সেটি যখন তা সরবরাহ করা হবে সে সময়ের মূল্যের তুলনায় কম হলে এটিও ইউজারি হিসেবে গণ্য হবে (দ্রষ্টব্য ৫৪)। ম্যাকলাফলিন বিলম্বিত পরিশোধের জন্য বেশি মূল্য গ্রহণকেও ইউজারিমূলক লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (দ্রষ্টব্য ৫৫)।

৪.৩ পণ্ডিতদের মধ্যে ঐকমত্য

ম্যাকলাফলিনের মতে, ক্যানন আইনে ঋণদাতার ঝুঁকি থাকলেও মূলধনের চেয়ে বেশি গ্রহণ হবে ইউজারি (দ্রষ্টব্য ৫৬)। করপাস জুরিস ক্যানুনিসিতে বলা হয়েছে, যদি কেউ যে ঋণ দিয়েছে তার চেয়ে বেশি পাওয়ার প্রত্যাশা করে তাহলে তিনি হবেন ইউজারিখাদক (দ্রষ্টব্য ৫৭)।

পোপ তৃতীয় আরবান (Urban III)-এর নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রদত্ত ঋণের অঙ্কের চেয়ে বেশি না পেলে ঋণ দিতে অনাগ্রহী ব্যক্তি হবে উসরিখোর। সেই ব্যক্তিও একইভাবে চিহ্নিত হবেন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দানের জন্য শপথের মাধ্যমে ওয়াদা করার পরও তাকে শুভেচ্ছা হিসেবে ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই উভয়ে ইউজারি নেয়ার জন্য দোষী হবেন তাদের উদ্দেশ্য বিবেচনায় (দ্রষ্টব্য ৫৮)।

ব্যাংকিংপন্থী পণ্ডিতরা মনে করেন, মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের যুক্তিতর্ক আধুনিক সময়ের ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য চলে না।

তারা ইউজারি (রিবা) এবং সুদের মধ্যে তিনটি পার্থক্য রেখা টানেন। আর এই তিন যুক্তিকে রিবা এবং সুদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে :

ক. রিবা মানে হলো ইউজারি এবং যাকে সুদ বলা হচ্ছে, বিশেষ করে ব্যাংকের সুদ রিবার মধ্যে পড়ে না।

খ. দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য রিবা চুক্তি করেন। অন্য দিকে সুদ বাণিজ্যিক, উৎপাদনশীল এবং লাভজনক খাতে দেয়া হয়।

গ. সুদের হার যুক্তিসঙ্গত লাভ বা রিটার্ন হিসেবে গণ্য। অন্য দিকে 'রিবা'য় অত্যধিক, মাত্রাতিরিক্ত এবং শোষণমূলক সুদ হার থাকে।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সুদকে মডারেট বা সহনীয় প্রমাণ করা হয়। অন্য দিকে রিবা গলাকাটা এবং অত্যাচারী ধরনের। ফলে তাদের মতে ব্যাংক সুদের মতো নমনীয় সুদ হারকে গলাকাটা এবং অত্যাচারী রিবার (ইউজারি) সাথে তুলনা করা যায় না। আধুনিক যুগের কিছু পণ্ডিত ইসলামে রিবার ব্যাপারে একই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন এবং মাত্রাতিরিক্ত শোষণমূলক হিসেবে একে দেখেন (দ্রষ্টব্য ৫৯)। এই দলের অভিমত হলো সব ধরনের সুদ রিবা (ইউজারি) নয়। অন্য একটি দল মনে করেন শুধু 'অত্যধিক' সুদই নয়, সব ধরনের সুদকে রিবা গণ্য করা যেতে পারে (দ্রষ্টব্য ৬০)।

শেষোক্তদের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব খুরশিদ আহমেদ বলেছেন, যে তিনটি প্রেক্ষিতে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তাত্ত্বিকভাবে তা অগ্রহণযোগ্য এবং প্রায়োগ্রিকভাবে ভিত্তিহীন। তিনি যুক্তি দেখান যে, রিবা ও ইউজারির মধ্যে বিধিনিষেধ সীমাবদ্ধ রেখে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র থেকে সুদকে বাইরে রাখা যাবে এমনটি অর্থনৈতিক বা শরী'আহ্র সঠিক যুক্তি হতে পারে না। তিনি আরোও বলেন যে বাইরের চাহিদার দিক থেকে অথবা সরবরাহের দিক থেকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করলে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে যা দাঁড়ায় তাতে সুদ ও ইউজারি অভিন্নই মনে হবে। এটা যদি অপেক্ষার জন্য একটি পুরস্কার হয়, তাহলে সুদ এবং ইউজারির (রিবা) মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হতে পারে না। খুরশিদ

আহমেদ বলেন, প্রশ্নটি যদি উৎপাদনশীলতার দিক থেকে পরীক্ষা করা হয় তাতেও এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

যা-ই হোক না কেন দুয়ের মধ্যে পার্থক্যকারী বক্তব্য এসেছে এই নৈতিক ভিত্তি থেকে যে ইউজারি উচ্চ এবং মাত্রাতিরিক্ত হারের, আর সুদের হার কম এবং একই সাথে যুক্তিসঙ্গত। এ ছাড়া দ্বিতীয় পার্থক্যটি এসেছে ইউজারি নেয় দরিদ্ররা তাদের ভোগের খরচের জন্য, আর সুদের ঋণ দেয়া হয় লাভজনক বাণিজ্যিক খাতে। খুরশিদ আহমেদ মনে করেন, এমন অজুহাতের মধ্যে আসলে কোনো অর্থনৈতিক সারবত্তা নেই (দ্রষ্টব্য ৬২)। ভোগের জন্য খরচের ঋণ বা উৎপাদন ঋণ অথবা উচ্চ হার বা কম হার বা ঋণটি দরিদ্র ব্যক্তি না ধনী ব্যক্তি নিচ্ছে এগুলোর মধ্যে আসলেই কোনো পার্থক্য নেই (দ্রষ্টব্য ৬৩)।

খুরশিদ আহমদের উপলব্ধি এবং ওপরে উল্লিখিত সাধারণ সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রেখে করা গবেষণাগুলোতে দেখা যায়, মতামতের প্রবণতা বিশ্লেষণ অনুসারে সুদ এবং ইউজারির মধ্যে কোনো কৌশলগত পার্থক্য নেই। গবেষণায় আরো দেখা যায়, ইউজারি বলতে শুধু 'অত্যধিক' সুদ গ্রহণকে নয়, সব ধরনের সুদকে বোঝায়- এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত (দ্রষ্টব্য ৬৪)।

অর্থপ্রাপ্তির মূল্যের চেয়ে অধিক অর্থপ্রদান ইউজারি (রিবা) হিসেবে গণ্য হবার পর বলা যায়, এটি বিনিময় ন্যায়ানুগতার বিরুদ্ধে অপরাধ। টাকা যেহেতু অনুৎপাদনশীল অর্থাৎ নিজে কিছু উৎপাদন করতে পারে না সেহেতু ধার দেয়ার পর অহেতুক বাড়তি টাকা গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ নয়। অধিকন্তু, ইউজারি (রিবা) দরিদ্র থেকে ধনীর কাছে সম্পদ স্থানান্তর করে এবং এটি ব্যক্তি বিশেষ এবং সমাজের জন্যও ক্ষতিকর (দ্রষ্টব্য ৬৫)।

৫. বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ইউজারি (রিবা)

৫.১ ইউজারি (রিবা) নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি

টাকার নিজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ইউজারির (রিবা) ওপর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে প্রধান দার্শনিক যুক্তির ভিত্তি। ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় ল্যাটার্ন কাউন্সিল, ইউজারির নিন্দা জানিয়ে বলেছিল, অর্থ ঋণদাতা বা মহাজন হওয়ার জন্য অনেক ব্যক্তি তাদের অন্য পেশা ত্যাগ করেছে (দ্রষ্টব্য ৬৬)। ইউজারি গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলে অনেক খারাপ লোক তাদের অনুসরণ করবে। মানুষ তাদের জমি চাষ করে ফসল ফলানোর প্রতি অবহেলা করবে। এটি দুর্ভিক্ষের কারণও হতে পারে এবং এতে গরিবরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের হাতে পশু না থাকলেও জমি রয়েছে, কিন্তু তারা ইউজারিতে টাকা লগ্নির মাধ্যমে সেখান থেকে বেশি এবং অনেকটাই নিশ্চিত মুনাফা পাওয়া গেলে সে জমিকে কাজে লাগাবে না। কারণ কৃষিকাজে লাভে যেমন অনিশ্চয়তা রয়েছে তেমনিভাবে তাতে মুনাফাও কম। এভাবে কৃষি নিরুৎসাহিত হলে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হবে এবং গরিব মানুষ তা কেনার সামর্থ্য হারাবে (দ্রষ্টব্য ৬৭)।

ইউজারি পরিশোধ আজীবন মানুষকে দারিদ্র্যে নিপতিত করে রাখবে এবং যে ব্যক্তি ইউজারির কারবার করবে তার মূর্তিপূজার মতো পাপ হবে। 'তার হৃদয় পড়ে থাকবে অর্থলোলুপতায়' (দ্রষ্টব্য ৬৮)। তাই ইউজারি হিতৈষী কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং আমরা যে আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসি আর প্রয়োজনে তাদেরকে সাহায্য করি তাকে নিরুৎসাহিত করে (৬৯ দ্রষ্টব্য)। দারিদ্র্য না কমলে কারো পক্ষে দীর্ঘ দিন ইউজারি বহন করা সম্ভব নয় (দ্রষ্টব্য ৭০)।

আমার মতে, বিনিময় মাধ্যম হিসেবে তার মৌলিক কাজ থেকে 'অর্থ' এর বিচ্যুতি আর্থিক সঙ্কটের মূল ভিত্তি। টাকাকে এখন বাণিজ্যের একটি বস্তু বানিয়ে ফেলা হয়েছে আর পুরো অর্থনীতিতে একে ঋণের ওপর ঋণ-এর বেলুনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ কারণে ইমাম আল-গাজ্জালি ৯০০ বছর আগে বিরূপ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়ে বলেছিলেন, টাকাকে কোনোভাবেই বাণিজ্যের একটি বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "রিবা (সুদ) নিষিদ্ধের কারণ হলো এটি বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এটি তখন ঘটে যখন কোনো ব্যক্তিকে সুদের ভিত্তিতে বাড়তি টাকা আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়। [...] এতে বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিজেকে না জড়িয়ে সুদের ভিত্তিতে অর্থ উপার্জন করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এটি মানবতার স্বার্থকে ব্যাহত করে, কারণ প্রকৃত বাণিজ্য, শিল্প বা নির্মাণ দক্ষতা ছাড়া মানবতার স্বার্থ নিশ্চিত হতে পারে না" (দ্রষ্টব্য ৭১)।

এ সব কিছু হচ্ছে আরো অর্থ উৎপাদনের একটি মেশিন হিসেবে সুদের মাধ্যমে টাকা খাটানোর অনুমতি দেয়ার কারণে। এতে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে টাকার কাজটি সমীকরণের বাইরে থেকে যাচ্ছে। অনেক অর্থনীতিবিদ সুদের এই রূপটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাদের একজন, জেমস রবার্টসন লিখেছেন : "অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদের পরিব্যাপক ভূমিকার ফলে যাদের কম আছে তাদের টাকা যাদের বেশি আছে তাদের কাছে নিয়মানুগভাবে স্থানান্তর হয়ে চলেছে। দরিদ্র থেকে ধনীদের কাছে সম্পদের এই স্থানান্তরের বিষয়টি তৃতীয় বৈশ্বিক ঋণ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে স্পষ্ট হয়েছে": [...] আংশিকভাবে এর কারণ হলো যাদের অর্থ আছে তারা ঋণ দিতে পারে আর যাদের নেই তাদের তুলনায় বেশি সুদ পায়। এটি অংশত এ কারণেও হয় যে সুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন পণ্য এবং পরিষেবার আকারে পরিশোধ হচ্ছে, আর প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার বড় অংশ তৈরি হয় ধনীদের অর্থায়নে। আমরা যখন আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি এভাবে তাকাই এবং যখন আমরা দক্ষ সামর্থ্যবান আর টেকসই অর্থনীতি গঠন ও এর কার্যক্রমকে যথার্থ ধারায় নিয়ে আসতে নতুন করে বিন্যাসের কথা ভাবি, তখন একবিংশ শতকের জন্য সুদমুক্ত মুদ্রাব্যবস্থার যুক্তিই জোরালো হয়ে ওঠে (দ্রষ্টব্য ৭২)।

৫.২ ব্যাংকিং খাত

পশ্চিমা ব্যাংকগুলো তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করতে অতিমাত্রায় ঋণ দেয়। তারা তাদের আমানতকারীদের সুদসহ আমানত পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায়। এটি ঋণের অসুস্থ বিস্তার ঘটায় এবং অত্যধিক লিভারেজ সৃষ্টি করে, কম দরকারি ঋণ সৃষ্টি করে, সাধ্যের বাইরে জীবন কাটাতে বাধ্য উৎসাহিত করে (দ্রষ্টব্য ৭৩)।

দুটি কারণে পশ্চিমা ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হবে না বলে ধরে নেয়া হয়। প্রথমত, তাদের ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত জামানত থাকে। সেখানে কোনো ঝুঁকি-অংশীদারিত্ব না থাকলেও ব্যাংক সবসময় অতিরিক্ত জামানত মূল্যায়নে ফটকা সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করে। দ্বিতীয় যে ফ্যাক্টর ব্যাংককে সুরক্ষা দেয় তা হলো এ ধারণা যে, "ব্যাংক এত বড় যে তা ব্যর্থ হওয়ার মতো নয়"। এটি তাদের আশ্বস্ত করে যে, বিপদে পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেখান থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া ব্যাংক এমন নিরাপত্তাব্যবস্থার জালে সমৃদ্ধ থাকে যে, অন্যরা যা পারে তার চেয়েও অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে তারা আগ্রহী হয় (দ্রষ্টব্য ৭৪)।

সহজ ঋণপ্রাপ্যতা সরকারি খাতের উচ্চঋণ প্রোফাইল এবং বেসরকারি খাতে সাধ্যবহির্ভূত জীবনযাত্রা আর উচ্চপর্যায়ের বিকল্পকে সম্ভব করে তোলে। এটিই আবার আর্থিক ভঙ্গুরতা এবং ঋণসঙ্কটের কারণ হয়। ঝুঁকি অংশীদারিত্ব না থাকায় ঋণের সহজপ্রাপ্যতা এবং এর ফলে ঋণের উল্লম্ফন বৃদ্ধি আর্থিক বাজারে বিশৃঙ্খলার কারণ হয় (দ্রষ্টব্য ৭৫)। ২০০৭ সালে শুরু হওয়া বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের ফলে পশ্চিমা ব্যাংকগুলোকে উদ্ধারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপকে তিন থেকে চার ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়েছে। আর্থিক সঙ্কট অর্থবাজারকে সীমিত করে ফেলেছে। আর সম্পত্তি ও স্টকের মূল্যহ্রাস ঘটিয়েছে। একই সাথে ব্যাংকের ব্যর্থতা বেড়েছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে স্নায়বিক উদ্বেগের বিস্তৃতি ঘটেছে। এ সব কিছু পশ্চিমা সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মৌলিকভাবে ভুল কিছু রয়ে গেছে মর্মে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি তৈরি করেছে।

৬. পশ্চিমা সুদভিত্তিক মডেলের বিকল্প : ইসলামী আর্থিক কাঠামো

বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে এটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় সংস্কার খুব দ্রুত প্রয়োজন। এই সঙ্কট আমাদের যাত্রাপথকে পুনরায় ভাবতে এবং নতুন নিয়ম ও পরিকল্পনা তৈরিতে বাধ্য করে। সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সুযোগ এনে দেয় এই সঙ্কট। শুধু স্বার্থ, সুবিধা এবং ক্ষমতার সমীকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ব্যবস্থা মানবতাকেন্দ্রিক একটি বিশ্ব তৈরি করতে সক্ষম হবে না। বৈশ্বিক ব্যাংকিং পদ্ধতি ইসলামী নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হলে আমরা এখন যে সঙ্কটের সাথে বসবাস করছি তার সম্মুখীন হতে হতো না।

সুদের নিজস্ব প্রকৃতি ও এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফল এটাই নির্দেশ করে যে, সুদ সমাজের নৈতিক ও বস্তুগত প্রবৃদ্ধির অন্তরায়। যেসব ঋণদাতা সুদকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তারা মূলত লোভ, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও অপকারিতার বাহক হয়। সমাজে এসব নেতিবাচক গুণাবলি দাতব্যসংশ্লিষ্ট ইতিবাচক গুণাবলিকে হালকা করে ফেলে (দ্রষ্টব্য ৭৬)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দানশীলতা মহিমান্বিত করেন এবং ইউজারি বা সুদকে তা থেকে বঞ্চিত করেন (দ্রষ্টব্য ৭৭)। ইসলাম সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে বলে কুরআন সুদ আরোপের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম সব ধরনের শোষণের নিন্দা করে। বিশেষত ঝুঁকির অংশীদারিত্ব ছাড়াই ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ঋণদাতার নিশ্চিত মুনাফা পেতে চাওয়ার মতো অবিচার। ঋণগ্রহীতা তার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে শ্রম ও সময় ব্যয় করে লাভের কোনো নিশ্চয়তা পাচ্ছে না, কিন্তু সুদ আকারে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ নিশ্চিত করা হচ্ছে ঋণদাতার। সুতরাং ঋণ ও অগ্রিমের ওপর সুদ আরোপ একধরনের শোষণ, যেখানে ঋণগ্রহীতা দুর্বল অবস্থানে থাকে (দ্রষ্টব্য ৭৮)।

এ রকম দৃষ্টান্তও আছে যেখানে দেনাদার একটি ঋণের মূল পরিমাণ অর্থ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরও সুদ জমে তার মূল পরিমাণের চেয়ে বেশি বকেয়া সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামে অর্থ শুধু একটি বিনিময় মাধ্যম, এর নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। তাই সুদ প্রদানের মাধ্যমে টাকার আরো বেশি বৃদ্ধির অনুমতি দেয়া উচিত নয়। কোনো ব্যবসায় ধার দেয়ার মানে সেখানে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হয়, মূলধন হিসেবে নয়। সুতরাং তা কোনো প্রতিদানের (সুদ) দাবিদার হয় না। ইউজারি কোনো ঋণের পুরোপুরি শোধ করা প্রায় অসম্ভব করে তোলে। দরিদ্ররা একের পর এক ঋণ নিতে বাধ্য হয় এই দুষ্ট চক্র থেকে বের হওয়ার জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। দরিদ্র ব্যক্তিটি ইতোমধ্যে মূল অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি টাকা দিয়ে দেন, কিন্তু ইউজারির (রিবা) কারণে তার বকেয়া বেড়ে উঠতে থাকে। ব্রিটিশ মিডিয়ায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত গল্পের মধ্য দিয়ে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে।

ডেভিড টেলর নামে একজন লিউকেমিয়া রোগীকে একটি নামকরা পশ্চিমা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ব্যাংকের উচ্চসুদের কারণে ব্যাংকে তার ওভারড্রাফট ক্রমেই ভয়ানক হারে বেড়ে যায়। অসহায় ও অসুস্থ মানুষটি চিন্তিত ছিল আরো যত দিন তিনি বেঁচে থাকবেন তত দিনের জন্য টাকা তার জীবনবীমার পলিসি থেকে কেটে নেয়া হবে। এরপর তার পরিবারের জন্য খুব সামান্য অর্থ অবশিষ্ট থাকবে। তার জীবনের প্রতিটি অতিরিক্ত দিনের অর্থ হলো তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য টাকা কমে যাওয়া। কাজেই তিনি নিজের জীবন দীর্ঘ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এই উদাহরণে ঋণের ওপর অতিরিক্ত খরচ ধার্য করার ফলে কী ধরনের ভোগান্তি সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঋণগ্রহীতা যেখানে সামর্থ্য রাখে না ইসলাম সেখানে এইভাবে অতিরিক্ত টাকা

আদায়ের অনুমতি দেয় না, শুধু ঋণের মূল অঙ্কই আদায় করার অনুমতি দেয় (দ্রষ্টব্য ৭৯)। এই নৈতিক এবং অর্থনৈতিক যুক্তিতে ইসলাম সব ধরনের ইউজারি (রিবা) বা সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে।

৬.১ ইউজারি (রিবা)বিহীন জীবন

সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজ নড়বড়ে হয়ে দুর্যোগের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এ রকম সময়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পুনরুত্থান ভালো প্রভাব ফেলতে করতে শুরু করেছে। ইসলাম নিছক একটি আধ্যাত্মিক সূত্র নয় বরং নিজেই জীবনের পরিপূর্ণ বিধান যা সুদৃঢ় ভিত্তি ও ঐশ্বরিক নির্দেশাবলি দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। ইসলাম শুধু নৈতিকভাবে ইউজারির নিন্দা করেই থেমে থাকে না, এটি মানুষের চরিত্র পরিগঠনেও দৃষ্টি দেয়। যাতে সুদখোরি ব্যবসার কারণে নিষ্পেষিত সমাজ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং উদার সহযোগিতাভিত্তিক উদ্দীপক সমাজের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি সুদভিত্তিক (পুঁজিবাদী) সমাজে ব্যক্তিগতপর্যায়ে মানুষ শোষিত হয়। এর ফলে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মূলধন গঠনের জন্য সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঁজিধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি যৌথ অর্থনীতিতে একধরনের উদ্যমহীনতা তৈরি করে। পুঁজিবাদীব্যবস্থায়, এক ব্যক্তির যেকোনো উপায়ে সম্পদ স্ফীতিতে হাজার হাজার অদক্ষ ব্যক্তিকে রোজগারে অসমর্থ্য করে তোলে, যাদের জন্য সঞ্চয় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এর বিপরীতে যে সমাজে সুদের হার শূন্য, সেখানে প্রত্যেক নাগরিকের প্রয়োজন পূরণ ও উদ্বেগ-নিরসনের নিশ্চয়তা দেবে রাষ্ট্র এবং সম্পদ মজুদ ও কৃপণতার বিলোপ ঘটবে। সচ্ছল নাগরিকরা তাদের সুবিধা অনুসারে ব্যয় করবে যা দরিদ্র নাগরিকদের যথেষ্ট ক্রয়ক্ষমতা তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এটি বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করবে যা আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উন্নত আয়ের কারণে সঞ্চয় করতে পারবে। এই সঞ্চয় কৃপণতার চেতনা বা লোভ থেকে গড়ে উঠবে না বরং হবে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পণ্য। যা সমৃদ্ধিশালীকে অনেক উদ্বৃত্ত সম্পদের ভাগিদার করবে যেখানে সাহায্য করার মতো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভিত্তি এক দিকে সব ধরনের আর্থিক শোষণ পরিহার করা আর অন্য দিকে, সম্পদ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর জোর দেয়া। আমরা এখন যে বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের মোকাবেলা করছি সেই সঙ্কট দূরীকরণে অবদান রাখতে পারে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। পুঁজিবাদীব্যবস্থা এই সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে যার জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থা সামনে এগিয়ে চলেছে।

৬.২ উপসংহার

এই গবেষণা রিবার ধাঁধা বা প্রহেলিকা নিরসনে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে। এ গবেষণার ফলাফল হিসেবে একটি ঐকমত্য তৈরি হয়েছে যে, ইউজারি (রিবা) শুধুম 'অত্যধিক' সুদই নয়, বরং সুদের সব ধরনকেই প্রকাশ করে। বিশ্ব অর্থনীতি যদি এই অর্থনৈতিক বাস্তবতা বা তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারত তাহলে আমরা যে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে বসবাস করছি তার সম্মুখীন হতাম না। এ ছাড়া এই গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদ সমাজের নৈতিক ও বস্তুগত প্রবৃদ্ধির পথে একটি অন্তরায় যেখানে একজন ব্যক্তি শোষিত হতে পারে। এ ধারণা ইসলামে নিষিদ্ধ বলেই ইসলাম নৈতিকভাবে সুদ গ্রহণের নিন্দা করে। তাই ইসলাম মানুষের চরিত্র পরিগঠনে কাজ করে, যাতে সুদি ব্যবসার বস্তুগত সমাজে স্থান করে নিতে পারে একটি সহানুভূতিশীল এবং উদার সহযোগিতাভিত্তিক ও উদ্দীপনাভিত্তিক সমাজ। এ গবেষণা অনুসারে ইসলামী অর্থায়ন ও ব্যাংকিং আইন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হবে।

অনুবাদ : মাসুমুর রহমান খলিলী

তথ্যসূত্র

আহমাদ, কে (১৯৯৪); সুদ (রিবা) বর্জন : ধারণা এবং সমস্যা (Elimination of Riba: Concept and Problems); শিরকত প্রেস, লাহোর।

আনোয়ার, এম (১৯৮৭); সুদমুক্ত অর্থনীতি মডেলিং : সামষ্টিক-অর্থনীতি ও উন্নয়নে একটি সমীক্ষা (Modelling Interest-free Economy. A Study in Macro-Economics and Development); ইসলামিক থট ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট, ওয়াশিংটন ডি.সি.।

অ্যারিস্টোফেনিস (১৯৭১); (লুয়েবের অনুবাদ); মেলোনি (সম্পাদিত), গ্রিক রোমান এবং রাব্বিদের ধারণায় ইউজারি (সুদ) (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought)।

অ্যারিস্টট্ল (১৯৭১); Politica, জুয়েট অনূদিত; মেলোনি (সম্পাদিত), গ্রিক রোমান এবং রাব্বিদের ধারণায় ইউজারি (সুদ) (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought)।

বার্ক, জে (২০০৯); ইউজারি রিডাক্স : জন টি নুনানের ইউজারির স্কলাস্টিক বিশ্লেষণ নোট (Usury Redux: Notes on the Scholastic Analysis of Usury by John T. Noonan), কার্যপত্র নং ০৯০১; অর্থনীতি বিভাগ, অ্যাভে ম্যারিয়া ইউনিভার্সিটি।

চাপড়া, এম.ইউ (২০০৮); বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট: তীব্রতা কমাতে ও ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তি রোধে সাহায্য করতে পারে ইসলামী অর্থায়ন (The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance help Minimize the Severity and Frequency of such a Crisis in the Future); বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট বিষয়ে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের গ্লোবাল ফোরামে উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতকৃত নিবন্ধ।

দিওয়ানি (২০০০); ইসলামী বন্ড ইসলামী নয় (Islamic Bond is not Islamic); দি ব্যাংকার মিডিল ইস্ট।

ফেকেট, এ.ই (২০০৪); আয়ের মূলধনীকরণের বিধান (The Principle of Capitalization of Incomes); মনিটরি ইকোনমিক্স; গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি http:// www.marxists.org/subject/jewish/leon/ch3a.htm থেকে নেয়া

পবিত্র বাইবেল (১৯৮৪); আন্তর্জাতিক সংস্করণ; আন্তর্জাতিক বাইবেল সোসাইটি।

হোসটেনসিস (১৯৪০); ম্যাকলাফলিনের সুম্মা দ্য ইউজারিস (Summa de usuries In McLaughlin) (সম্পাদিত), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) (দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী); পন্টিফিক্যাল ইন্সটিটিউট অব মেডিয়াভল স্টাডিজ।

ইন্সটিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ (১৯৯৪); অর্থনীতি থেকে সুদ দূরীকরণ (Elimination of Riba from the Economy); লাহোর, শিরকত প্রেস।

মেলোনি, আর পি (১৯৭১); ইউজারি নিয়ে গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের ভাবনাচিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought), ট্রাডিশিও, নিউ ইয়র্ক, ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ম্যাকক্যাল, বি এম (২০০৮); অলাভজনক ঋণ: আধুনিক ক্রেডিট রেগুলেশন এবং সুদের হারানো তত্ত্ব (Unprofitable Lending: Modern Credit Regulation and the Lost Theory of Usury) (2008-2009), কারডোজা ল' রিভিউ, ৩০ (২), ৫৪৯-৬১৫।

মুনরো, জে এইচ (২০০৯); ম্যাকলাফলিন, টি পি (১৯৪০), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) (দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী); পন্টিফিক্যাল ইনস্টিটিউট অব মেডিয়াভ্যাল স্টাডিজ।

মুনরো, জে এইচ (২০০৯); আর্থিক বিপ্লবের মধ্যযুগীয় উৎস: সুদ, ভাড়া ও দরকষাকষি (The Medieval Origins of the "Financial Revolution": Usury, Rentes and Negotiability), অর্থনীতি বিভাগ; টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়; এমপিআরএ, ৫১১।

ফিলো (১৯৭১); ডি ভার্চুটিবাস, মেলোনি (সম্পাদিত); ইউজারি নিয়ে গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের ভাবনাচিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought)।

প্লেটো (১৯৭১); লিগেস, (লুয়েব অনূদিত), মেলোনি (সম্পাদিত)।

সিদ্দিকী, এস এইচ (১৯৯৪); ইসলামী ব্যাংকিং : আদিপুস্তক ও মূলনীতি, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ (Islamic Banking: Genesis & Rationale, Evaluation & Review, Prospects & Challenges) করাচি : রয়্যাল বুক কোম্পানি।

স্টেইন (১৯৫৬); অইহুদিদের কাছ থেকে ইহুদিদের সুদ গ্রহণ (Interest taken by Jews from Gentiles); সেমিটিক স্টাডিজ জার্নাল; http://dx.doi.org/10.1093/Jss/1.2.141

সোয়ার্জ, এন পি (২০০৯); সুদের (রিবা) ওপর নিষেধাজ্ঞা: ইসলামী অর্থায়ন এবং ব্যাংকিং আইনের একটি নৈতিক-নীতিগত দৃষ্টিকোণ : ইসলামী এবং প্রচলিত মডেলের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন (The Prohibition of Usury (Riba). A Moral-Ethical Perspective of Islamic Financial and Banking Law: A Comparative Study between the Islamic and the Conventional Model); শরী'আহ্ জার্নাল, ১৭ (২), ৪০৯-৪৩০।

উমর ইব্রাহিম ভ্যাদিলো (২০০৬); ব্যাংকিংয়ের ওপর ফতোয়া এবং ব্যাংক আমানত থেকে প্রাপ্ত সুদের ব্যবহার (Fatwa on Banking and the Use of Interest Received on Bank Deposits)

ভেসিও, এম এল (২০০৫); সুদসংক্রান্ত ন্যাশনাল ক্রেডিট বিল ২০০৫-এর ডুপলাম রুল এবং ধারা ১০৩ (৫)-এর প্রভাব (The Effects of the In Duplum Rule and Clause 103(5) of the National Credit Bill 2005 on Interest); মাস্টার্সের অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, প্রিটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিটোরিয়া।

উসমানী; সঙ্কটোত্তর সংস্কার : চিন্তার কিছু পয়েন্ট (Usmani Post-Crisis Reforms: Some Points to Ponder); বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (২০১০)।

দ্রষ্টব্য

১. অ্যারিস্টোফানেস, নুবেস (Aristophanes, Nubes) ১২৮৬ এফএফ (লুয়েব অনূদিত)।

২. আনোয়ার, সুদমুক্ত অর্থনীতির মডেলিং (১৯৮৭)।

৩. ম্যালোনির গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ৮৪।

৪. প্লেটো, লিগেস (Plato, Leges) ৫.৭৪২ (লুয়েব অনূদিত) (১৯৭১) ৮৬।

৫. অ্যারিস্টট্ল, পলিটিকা (Aristotle, Politica) ১.১০.১২৫৮ এ-বি (জাউয়েট অনূদিত), মেলোনি (১৯৭১) ৮৭।

৬. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ৯৫।

৭. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ৯৫।

৮. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ৯৪।

৯. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ৯০।

১০. স্টেইন (Stein), অ-ইহুদিদের কাছ থেকে ইহুদিদের সুদ গ্রহণ (Interest taken by Jews from Gentiles) ১৯৫৬, জার্নাল অব সেমেটিক স্টাডিজ-১৪১।

১১. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ৯২।

১২. স্টেইন, জার্নাল অব সেমিটিক স্টাডিজ (Stein, Journal of Semitic Studies) (১৯৫৬) ১৪১।

১৩. ভেসিও, ইন ডুপলাম বিধির প্রতিক্রিয়া (The Effects of the In Duplum rule) (২০০৫) ৯।

১৪. ফিলো (Philo) ডি ভার্চুটিবাস ১৪ ৮২-৮৩, মেলোনি (১৯৭১) ৯৮।

১৫. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ১০১।

১৬. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ১০৩।

১৭. স্টেইন, জার্নাল অব সেমিটিক স্টাডিজ (Stein, Journal of Semitic Studies) ১৪১।

১৮. স্টেইন, জার্নাল অব সেমিটিক স্টাডিজ (Stein, Journal of Semitic Studies) ১৪১।

১৯. স্টেইন, জার্নাল অব সেমিটিক স্টাডিজ (Stein, Journal of Semitic Studies) ১৪১।

২০. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ১০৫।

২১. ম্যালোনিঃ গ্রিক, রোমান ও রাব্বিদের সুদবিষয়ক চিন্তা (Usury in Greek, Roman and Rabbinical Thought) (১৯৭১) ১০৬।

২২. পবিত্র বাইবেল (The Holy Bible), আন্তর্জাতিক সংস্করণ, ম্যাথু ২৫ঃ ১৪-৩০; লুক ১৯ঃ ১১-২৭।

২৩. জন এইচ মুনরো, "আর্থিক বিপ্লবের মধ্যযুগীয় উৎস : সুদ ভাড়া ও দরকষাকষি (The Medieval Origins of the "Financial Revolution": Usury, Rentes and Negotiability); (২০০২). অনলাইন : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10925 MPRAPaper জুন ২৫ পেপার নং-১০৯২৫, পোস্টেড, ২৫ জুন ২০০৯।

২৪. টমাস অ্যাকুইনাস (Thomas Aquinas), সুম্মা থিওলজি (Summa Theologiae) ২-২, প্রশ্ন. ৭৮, এ ১।

২৫. সিদ্দিকী, ইসলামী ব্যাংকিং (১৯৯৪) ৫।

২৬. আনোয়ার, সুদমুক্ত অর্থনীতির মডেলিং (১৯৮৭)।

২৭. মুনরো, দ্য মেডিয়াভল অরিজিন্স (The Medieval Origins) (২০০৭) ৫১১-১২।

২৮. বার্ক (২০০৯), মধ্যযুগে সুযোগ, ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি ও খেলাপি ঝুঁকি (Opportunities cost inflation, and default risk in the Middle Ages)।

২৯. ফেকেটে (Fekete) (২০০৪) বক্তৃতা ৪ : ত্রিপক্ষীয় চুক্তি : যে আয়াতে ইউজারি নিষিদ্ধের কথা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কন্ট্রাকটাস ট্রিনাস চুক্তিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

৩০. দিওয়ানি (Diwany); ইসলামী বন্ড ইসলামী নয় (Islamic Bond is not Islamic) (২০০০); দি ব্যাংকার মিডিল ইস্ট; এই নিবন্ধটি মূলত www.islamic-finance.com-এ সামার ২০০০-এ প্রকাশিত হয়। এর একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ ব্যাংকার মিডল ইস্ট-এ ২০০২ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত।

৩১. স্টেইন, জার্নাল অব সেমিটিক স্টাডিজ (Stein, Journal of Semitic Studies) ১৪৩।

৩২. স্টেইন, জার্নাল অব সেমিটিক স্টাডিজ (Stein, Journal of Semitic Studies) ১৫৩/৪।

৩৩. স্টেইন, জার্নাল অব সেমিটিক স্টাডিজ (Stein, Journal of Semitic Studies) ১৫৭।

৩৪. স্টেইন, জার্নাল অব সেমিটিক স্টাডিজ (Stein, Journal of Semitic Studies) ১৬১।

৩৫. ম্যাকক্যাল (McCall) "অলাভজনক ঋণ দানঃ আধুনিক ক্রেডিট রেগুলেশন এবং ইউজারির হারানো তত্ত্ব" (Unprofitable Lending: Modern Credit Regulation and the Lost Theory of Usury) (২০০৮-২০০৯); কার্ডোজা ল' রিভিউ ৫৫৯।

৩৬. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin) দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ৯৮।

৩৭. ইনোসেন্ট ফোর (Innocent IV, Commentaria on x.V.19.C.1) ম্যাকলাফলিন (McLaughlin) দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ৯৮।

৩৮. হোস্টিয়েন্সিস, Summa de usuries, n.1, Fol. 372: "Quodcumque solutioni rei mutuatae accredit ipsius reiusus gratia pactione interposita, vel hac intentione habita in contractu, vel exactione habita post facto." In McLaughlin, The Teaching of the Canonists on Usury 98; দেখুনঃ www.ccsenet.org/jms; Journal of Management and Sustainability, খণ্ড ৩, সংখ্যা ৪; ২০১৩ ১৯৩।

৩৯. কনকর্ডিয়াডিসকাউন্টিউম ক্যাননুম Dictum before C.14, Q. 3, C. 1: ÒQuod autem praeter summam emolumenta sectari sit usuras; after c. 4: Ecce evidenter ostenditur quod quicquid ultra sortem exigitur usura est; before q. 4, C|

৪০. ম্যাকলাফলিন, টি. পি (McLaughlin, T.P), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) (দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী); পন্টিফিক্যাল ইনস্টিটিউট অব মেডিয়াভল স্টাডিজ; খণ্ড ৮১: ৮১–১৪৭: ৮১।

৪১. ম্যাকলাফলিন, টি পি (McLaughlin, T.P)' দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) (দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী); ৮১।

৪২. ম্যাকলাফলিন, টি পি (McLaughlin, T.P), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) (দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী); ৮৪।

৪৩. ম্যাকলাফলিন, উদ্ধৃত, সাইনাস Cod. Iv.32.24: Audivi Dynum dicentem quod non quia usurae prohibitae sunt jure divino et jure canonico et civili et quia foenerare est mortale peccatum sicut rapere.

৪৪. ম্যাকলাফলিন, উদ্ধৃত Cod. Iv.32.2: Secundae usurae similiter sunt permissae usque ad congruum et honestum modum prout mos regionis expostulat quia potius recipiuntur loco permutationis quam loco poenae,, Sunt enim hujusmodi usurae onerosae, non gratuitae, et fundantur in ratione naturali aequitate quae est quod quis non locupletur cum aliena jactura.

৪৫. Cod. Iv.32.2.

৪৬. ম্যাকলাফলিন, উদ্ধৃত Cod. Iv.32.2: Interesse enim est licitum quocumque nomine nuncupatur, tam in damno quam in lucro.

৪৭. ম্যাকলাফলিন, উদ্ধৃত Cod. Iv.32.2: Sed quare poena est licita super interesse, secus in usura? Respondeo quia in usura constat de intentione quod intendat esse usurarius.

৪৮. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ৯৪।

৪৯. C.14.Q.3.C.1 উদ্ধৃতি অনুসারে– ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ৯৫।

৫০. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ৯৫।

৫১. C.14.Q.3.C.1, উদ্ধৃত, ম্যাকলাফলিন Teaching of the Canonists on Usury 95: Quodcumque sorti accidit, et quodcumque velis ei nomen imponas.

৫২. C.14.Q.3.C.4, উদ্ধৃত, ম্যাকলাফলিন the Teaching of the Canonists on Usury 85: Ubi amplius requiritur quam quod datur.

৫৩. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ৯৫।

৫৪. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ৯৭।

৫৫. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ৯৭।

৫৬. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (The Teaching of the Canonists on Usury) ১০৩।

৫৭. C.14.Q.3.C.1: Si feneraveris hominem, id est sit u mutuum dederis pecuniam tuam a quo plus quam dedisti expectes… fenerator es.Ó In McLaughlin The Teaching of the Canonists on Usury 106.

৫৮. X.V.19.C.10: Hujusmodi hominess pro intentione lucre quam habent… judicandi sunt male agree, et ad ea quae taliter sunt accepta restituenda, in animarum judicio efficaciter inducendi. In McLauglin the Teaching of the Canonists on Usury 106.

৫৯. সুয়ার্টজ, এনপি (Swartz, N. P.), সুদের (রিবা) ওপর নিষেধাজ্ঞা : ইসলামী অর্থায়ন এবং ব্যাংকিং আইনের একটি নৈতিক-নীতিগত দৃষ্টিকোণ: ইসলামী এবং প্রচলিত মডেলের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন (The Prohibition of Usury (Riba). A Moral-Ethical Perspective of Islamic Financial and Banking Law: A Comparative Study between the Islamic and the Conventional Model); শরী'আহ্ জার্নাল, ১৭ (২), ৪০৯-৪৩০:৪১৫-৬।

৬০. সুয়ার্টজ, এনপি (Swartz, N. P.), সুদের (রিবা) ওপর নিষেধাজ্ঞা : ইসলামী অর্থায়ন এবং ব্যাংকিং আইনের একটি নৈতিক-নীতিগত দৃষ্টিকোণ: ইসলামী এবং প্রচলিত মডেলের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন (The Prohibition of Usury (Riba). A Moral-Ethical Perspective of Islamic Financial and Banking Law: A Comparative Study between the Islamic and the Conventional Model); ৪১৫।

৬১. ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ; অর্থনীতি থেকে সুদ দূরীকরণ (Elimination of Riba from the Economy); ৩৮।

৬২. ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ; অর্থনীতি থেকে সুদ দূরীকরণ (Elimination of Riba from the Economy); ৩৯।

৬৩. ভ্যাডিলো (Vadillo), ব্যাংকিং সংক্রান্ত ফতোয়া (Fatwa on Banking) (২০০৬) ৩৪।

৬৪. ম্যাকক্যাল (McCall), কারডোজা ল' রিভিউ (Cardoza Law Review) ৫৬৯।

৬৫. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), পন্টিফিক্যাল ইন্সটিটিউট থ্রি (Pontifical Institute iii)।

৬৬. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), পন্টিফিক্যাল ইন্সটিটিউট থ্রি (Pontifical Institute iii)।

৬৭. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), পন্টিফিক্যাল ইন্সটিটিউট থ্রি (Pontifical Institute iii)।

৬৮. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), পন্টিফিক্যাল ইন্সটিটিউট থ্রি (Pontifical Institute iii)।

৬৯. ম্যানেজমেন্ট এবং সাসটেনিবিলিটি www.ccsenet.org/jms জার্নাল, খণ্ড ৩ নং ৪; ২০১৩।

৭০. ম্যাকলাফলিন (McLaughlin), পন্টিফিক্যাল ইন্সটিটিউট থ্রি (Pontifical Institute iii)।

৭১. উসমানী (Usmani); সঙ্কটোত্তর সংস্কার : চিন্তার কিছু পয়েন্ট (২০১০) ১৯-২০, (Post-Crisis Reforms: Some Points to Ponder) (২০১০) ১৯–২০. বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে উপস্থাপিত।

৭২. উসমানী (Usmani), সঙ্কট উত্তর সংস্কার (Post-Crisis Reform) (২০১০) ১৯–২০।

৭৩. চাপড়া (Chapra), বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট (The Global Financial Crisis) (২০০৮) ৪।

৭৪. চাপড়া (Chapra), বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট (The Global Financial Crisis) (২০০৮) ৪।

৭৫. চাপড়া (Chapra), বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট (The Global Financial Crisis) (২০০৮) ৫।

৭৬. আহমদ, সুদের বিলুপ্তি (Elimination of Riba) (১৯৯৪) ৪৮।

৭৭. পবিত্র কুরআন, সূরা আল-বাকারা ২:২৭৬।

৭৮. সিদ্দিকী, ইসলামী ব্যাংক (Islamic Banks) (১৯৯৪) ২৫।

৭৯. সিদ্দিকী, ইসলামী ব্যাংক (Islamic Banks) (১৯৯৪) ২৬।

সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা[১]

পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই সুদকে ঘৃণ্য বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতেও সুদ একটি বড় সমস্যা হিসেবে ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত। বর্তমান অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক অস্থিরতার মূলেও রয়েছে সুদের কুপ্রভাব। মূলত সুদ হলো শোষণের হাতিয়ার, যা ধনীকে আরো ধনী করে এবং গরিবকে করে আরো গরিব।

পবিত্র কুরআনে রিবা বা সুদকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনে সুদ পরিহার না করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে। অথচ অন্য কোনো গুনাহ সম্পর্কে এমন কঠিন ও কঠোর কথা বলা হয়নি। রাসূল (স.)-এর হাদিসেও সুদকে কঠিন গুনাহের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক ও সাক্ষীদের ওপর রাসূল (স.) অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী। এমতাবস্থায় সুদের বহুমাত্রিক ক্ষতি থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করে ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। সর্বপ্রথম আমরা দেখব সুদ বা রিবা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কী বলা হয়েছে।

সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন

সুদ এমন একটি পাপ যা সরাসরি কুরআন দিয়ে নিষিদ্ধ। আল কুরআনের ৪টি সূরার মোট ১২টি আয়াতে সুদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ৫টি ধাপে উল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

০১. প্রথমপর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত : সুদে বরকত নেই; বরকত আছে যাকাতে

> ‘এবং মানুষের ধনসম্পদের মধ্যে (মিশে তোমাদের সম্পদ) বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তোমরা সুদের ভিত্তিতে যা কিছু (মানুষকে) দিয়ে থাকো, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং (এটি যারা করে) তারাই বৃদ্ধিকারী।’[২]

---

১ **মোহাম্মদ আবদুল মান্নান**, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড; ভাইস চেয়ারম্যান, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ; ইসলামিক ব্যাংকস্ কন্‌সালটেটিভ ফোরাম (আইবিসিএফ)-এর টাস্ক কমিটির চেয়ারম্যান; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য; সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য; ইতিহাস গবেষক।

মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

২ আল কুরআন, সূরা আররূম, আয়াত-৩৯।

এ আয়াত হিজরতের ৫ বছর আগে নাজিল হয়। এটি সুদের ওপর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এ আয়াতে সুদকে সরাসরি হারাম ঘোষণা করা হয়নি। তবে সুদের নেতিবাচক দিকটি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সুদে প্রকৃত কল্যাণ ও বরকত নেই বরং সত্যিকারের কল্যাণ ও বরকত নিহিত আছে যাকাতের মধ্যে।

০২. দ্বিতীয়পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত : সুদের কারণে ইহুদিদের শাস্তি হয়েছিল

‘এবং যারা ইহুদি হয়েছে তাদের জুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর হারাম করেছিলাম এমন কিছু পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য (পূর্বে) হালাল ছিল এবং অনেককে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে:[৩]

এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা (গ্রহণ করতে) তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং মানুষের ধনসম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রাস করার কারণে। এবং তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।’[৪]

সূরা নিসার উক্ত ১৬০ ও ১৬১ নং আয়াত দুটি হিজরতের পর রাসূল (স.)-এর মাদানি জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়। এ আয়াত দুটি সুদের ব্যাপারে দ্বিতীয়পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত। এখানে সুদকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনার মতো একটি গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ইহুদিদের কয়েকটি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে শাস্তি ভোগ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এসব গুনাহের মধ্যে ছিল মানুষের মধ্যে জুলুম করা, মানুষকে অন্যায়ভাবে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা এবং সুদ গ্রহণ করা যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে; অর্থাৎ সুদের মতো একটি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

০৩. তৃতীয়পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত : চক্রবৃদ্ধি সুদ নিষিদ্ধ

‘ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দ্বিগুণ-বহুগুণে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো,[৫]

এবং তোমরা সে আগুনকে ভয় করো যা কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।’[৬]

সূরা আলে ইমরানের উক্ত ১৩০ ও ১৩১ নং আয়াত দুটি হিজরি তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের পর নাজিল হয়। এ আয়াত দুটি সুদের ব্যাপারে তৃতীয়পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত। এটি

---

৩ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১৬০।

৪ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১৬১।

৫ আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০।

৬ আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩১।

সুদ নিষিদ্ধের প্রথম আয়াত এবং এখানে চক্রবৃদ্ধি সুদের উল্লেখ করা হয়। এ আয়াত দুটি সুদের ব্যাপারে নাজিল হওয়া সর্বশেষ আয়াত নয়; এরপরেও সুদের ব্যাপারে আরো আয়াত নাজিল হয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে– সুদ মাত্রই হারাম। সেখানে চক্রবৃদ্ধি হওয়া-না-হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তীকালে নাজিল হওয়া আয়াতসমূহের বর্ণনা এর পরই রয়েছে।

০৪. চতুর্থপর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত : বেচাকেনা হালাল আর সুদ হারাম

'যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) কেবল সেই ব্যক্তির দাঁড়ানোর মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়। এটি এ কারণে যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই, অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। এরপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছে গেছে এবং সে (সুদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, তবে যা অতীত হয়েছে তা তারই এবং তার বিষয়টি আল্লাহরই কাছে (সমর্পিত)। আর যারা পুনরাবৃত্তি করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।'[৭]

'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ্ কোনো অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না।'[৮]

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত (নামাজ) কায়েম করেছে ও যাকাত প্রদান করেছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান এবং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।'[৯]

সূরা আল বাকারাহ্‌র উক্ত ২৭৫, ২৭৬ ও ২৭৭ নং আয়াতগুলো সূরা আলে ইমরানের ১৩০-১৩৬ নং আয়াত নাজিলের অল্প সময় পর নাজিল হয়। এখানে পণ্য বেচাকেনাকে হালাল এবং সুদকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়। এখানে সব ধরনের সুদ কম কিংবা বেশি যা-ই হোক, চক্রবৃদ্ধি অথবা সরল সবই হারাম ঘোষণা করা হয় এবং সুদের ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়। আরো জানানো হয়, আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।

---

৭ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৭৫।

৮ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৭৬।

৯ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৭৭।

০৫. পঞ্চমপর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত : সুদ না ছাড়লে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা

'ওহে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সুদ থেকে যা বাকি (পাওনা) রয়েছে তা ছেড়ে দাও– যদি তোমরা মু'মিন হও।'[১০]

'কিন্তু যদি তোমরা তা না করো, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের ঘোষণা জেনে নাও, আর যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই জন্য (বৈধ হবে), তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।'[১১]

'এবং যদি সে (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও। আর সদকা (মাফ) করে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।'[১২]

'এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। এরপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতিফল পুরোপুরি দেয়া হবে, এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।'[১৩]

সূরা আল বাকারাহ্‌র উক্ত ২৭৮ থেকে ২৮১ নং আয়াতগুলো দশম হিজরি সালে বিদায় হজের আগে নাজিল হয়। এখানে সুদের বকেয়া পাওনা ছেড়ে দিয়ে সুদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছেদ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যথায় আল্লাহ ও রাসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। অর্থাৎ সুদের সাথে সম্পর্ক রাখা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল বলে উল্লেখ করা হয়। এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে সুদের গুনাহের ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়।

সুদের ব্যাপারে পাঁচটি পর্যায়ে নাজিল হওয়া আয়াতগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, হিজরতের পাঁচ বছর আগে সুদ সম্পর্কে নাজিল হওয়া প্রথম আয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, সুদে বরকত ও কল্যাণ নেই; বরং কল্যাণ ও বরকত রয়েছে যাকাতে। এ আয়াতে সুদকে সরাসরি হারাম বলা হয়নি। ফলে এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর অনেকে স্বেচ্ছায় সুদ ছেড়ে দেয়।

এর প্রায় ছয় বছর পর সুদ সম্পর্কে দ্বিতীয়পর্যায়ে নাজিল হওয়া আয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, সুদের কারণে ইহুদিদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। অতএব তা একটা খারাপ কাজ। এখানেও

---

১০ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৭৮।

১১ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৭৯।

১২ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৮০।

১৩ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৮১।

হারাম বা নিষিদ্ধ শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। তবে এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আরো অনেকে সুদ পরিত্যাগ করেন।

এর প্রায় তিন বছর পর তৃতীয় হিজরিতে সুদ নিষিদ্ধ করে আয়াত নাজিল হয় এবং সেখানে চক্রবৃদ্ধি সুদের উল্লেখ করা হয়। এর ফলে সবাই চক্রবৃদ্ধি সুদ বর্জন করে। এরও কিছু দিন পর চক্রবৃদ্ধিসহ সব ধরনের সুদ হারাম ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ এপর্যায়ে ঘোষণা করা হয়, 'বেচাকেনা হালাল আর সুদ মাত্রই হারাম'।

এর প্রায় সাত বছর পর বিদায় হজের আগে সুদ সম্পর্কে নাজিল হওয়া সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়, সুদের অতীত বকেয়া ছেড়ে দিতে হবে এবং সুদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়।[১৪] সবশেষে বিদায় হজের ভাষণে রাসূল (স.) সুদ সম্পর্কে ঘোষণা করেন, 'জাহিলি যুগের সব সুদ বাতিল করা হয়েছে। সর্বপ্রথম আমি আমাদের রিবা বাতিল করছি, তা হচ্ছে (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পাওনা সুদ। তা সম্পূর্ণ বাতিল করা হলো।'[১৫]

এভাবে প্রথমে সুদের অকল্যাণের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা হয়, এরপর সুদের মধ্যে সবচেয়ে শোষণমূলক বলে পরিচিত চক্রবৃদ্ধি সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়। সবশেষে চক্রবৃদ্ধি ছাড়াও সব ধরনের সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়। এ পটভূমিতে রাসূল (স.) বিদায় হজের সময় সুদের দলিলকে পদদলিত করেন এবং সমাজ থেকে সুদকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেন।

সুদ সম্পর্কে রাসূল (স.)-এর হাদিস

০১. হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, 'রাসূল (স.) *সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক*, এবং সুদি লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন (পাপের দিক থেকে) তারা সবই সমান অপরাধী।'[১৬]

০২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, 'জেনে-বুঝে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা *ছত্রিশবার জিনা করার (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া)* চেয়ে মারাত্মক অপরাধ।'[১৭]

০৩. হজরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, '*ক্ষতিকর সাতটি বিষয় থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে*। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! সে

---

১৪ ধারাবাহিকভাবে নাজিলকৃত সুদের আয়াতসমূহ বিস্তারিত দেখুন এ বইয়ের ১১ নং পৃষ্ঠা।

১৫ বুখারী, মুসলিম।

১৬ মুসলিম, তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ।

১৭ মুসনাদে আহমাদ ও তিবরানি।

সাতটি বিষয় কী? জবাবে তিনি বললেন : (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, (২) জাদুবিদ্যা শিক্ষা ও প্রদর্শন করা, (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, (৪) *সুদ খাওয়া*, (৫) ইয়াতিমের মাল গ্রাস করা, (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো এবং (৭) কোনো সচ্চরিত্রা নারীকে অপবাদ দেয়া।'[১৮]

০৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) নবী (স.)-এর বিদায় হজের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) লোকদের সম্বোধন করে বললেন, '*জাহিলি যুগের সব সুদ বাতিল করা হয়েছে।*' সর্বপ্রথম আমি আমাদের সুদ বাতিল করছি, তা হচ্ছে (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পাওনা সুদ। তা সম্পূর্ণ বাতিল করা হলো।'[১৯]

০৫. আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'মানুষের জন্য অবশ্যই এমন একটি সময় আসবে যখন প্রত্যেকেই সুদ গ্রহণ করবে। আর কেউ যদি সুদ গ্রহণ না করে তাহলে *সুদের ধুলা হলেও তার কাছে পৌঁছবে।*'[২০]

০৬. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুদ সমৃদ্ধি আনে, কিন্তু *সুদের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে অভাব এবং সংকোচন।*'[২১]

০৭. আবু হুরাইরাহ (রা.) ও আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, 'রাসূল (স.) বনি 'আদি আল-আনসারী গোত্রের এক লোককে রাজস্ব আদায়ের জন্য খাইবার এলাকায় পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে উন্নত মানের কিছু খেজুর নিয়ে ফিরে এলেন।' রাসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খাইবারের সব খেজুরই কি এ রকম (উন্নত মানের)?' তিনি বললেন, 'না (খাইবারের সব খেজুর এ রকম উন্নত মানের নয়), হে আল্লাহর রাসূল। আমরা বিভিন্ন প্রকারের নিম্নমানের দুই সা'[২২] খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উন্নত মানের খেজুর কিনেছি।' তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'তা কোরো না, বরং মানে সমান সমান (মিসলান বিমিসলিন) হতে হবে। অথবা তোমার খারাপ খেজুর বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে উত্তম খেজুর কিনবে। এভাবেই পরিমাপ (পূর্ণ হবে)।'[২৩]

ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট রিবা যা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ– এর বাইরে পণ্য বিনিময়ের সময়ও যে সুদ হতে পারে তা রাসূল (স.) উল্লিখিত হাদিসে জানানোর আগ পর্যন্ত সে সময়ের আরবের লোকদের জানা ছিল না। এমনকি রাসূল (স.)-এর সাহাবিগণও জানতেন না। উক্ত হাদিসে রাসূল (স.) সমজাতীয় পণ্য (গুণগত মান বিবেচনায়) কম-

১৮ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

১৯ মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

২০ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

২১ মুসনাদে আহমাদ।

২২ এক সা' সমান ৩ কেজি ২৭০ গ্রামের কিছু বেশি। (সূত্র : আওয়ানে শারইয়্যাহ, মুফতি মুহাম্মাদ শফী র., পৃ.-১৮)

২৩ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ:৩৫২, নং ৩৯৩৫।

বেশি করে বিনিময় করতে নিষেধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মনে হতে পারে দুই সা' নিম্নমানের খেজুর দিয়ে এক ছা' উন্নতমানের খেজুর বিনিময়ে দোষের কিছু নেই। কারণ, গুণগত মান (quality) ভালো হওয়ায় বেশি নেয়ায় দোষের কী আছে? কিন্তু বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। কারণ, গুণগত মান খুবই সূক্ষ্ম বিষয়। এটি স্বাদ, গন্ধ, ব্যবহারকাল ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সমজাতীয় দ্রব্য দিয়ে গুণগত মানের পার্থক্য পরিমাপ করা কঠিন। তা ছাড়া দ্রব্যের গুণগত মান সম্পর্কে সবার অভিজ্ঞতা থাকে না বলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া পণ্য বিনিময়ের সময় গুণগত মান অনুমান করা যায়; আর নিশ্চিত হওয়া যায় কেবল ভোগ-ব্যবহারের পরেই। এ কারণেই রাসূল (স.) অন্য এক হাদিসে বলেছেন, 'পণ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্রহণ করা রিবা (সুদ)।' তাই সমজাতীয় পণ্য বিনিময় না করে তা প্রচলিত বাজারদরে নিম্নমানের পণ্যটি বিক্রি করে প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে প্রচলিত বাজারদরে উন্নতমানের সমজাতীয় পণ্য কিনলে ঠকার আশঙ্কা থাকে না। তাই পণ্যের বিনিময়কালে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ বা প্রদান করার ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার জন্য রাসূল (স.) সমজাতীয় পণ্য বিনিময়কালে কমবেশি করতে নিষেধ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আদান-প্রদানকে অন্য হাদিসে সুদ বলে উল্লেখ করেছেন।

০৮. আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'সোনার সাথে সোনা, রূপার সাথে রূপা, গমের সাথে গম, যবের সাথে যব, খেজুরের সাথে খেজুর এবং লবণের সাথে লবণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমানে সমান এবং হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে। এরূপ বিনিময়ে যে বেশি বা কম দেয় বা নেয়, সে সুদি কারবার করে। এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান।'[২৪]

০৯. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি কাউকে ঋণ দাও তারপর ঋণগ্রহীতা যদি তাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, ঋণদাতার তা গ্রহণ করা উচিত নয়; *ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে তার পশু-বাহনে ভ্রমণ করার প্রস্তাব করে তাহলে তাতে ওঠা ঋণদাতার উচিত নয়* যদি তারা আগে থেকে অনুরূপ আনুকূল্য বিনিময়ে অভ্যস্ত না হয়ে থাকে।'[২৫]

১০. আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি অন্যকে ধার দেয়, *তাহলে কোনো উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা তার উচিত নয়।'*[২৬] *উল্লিখিত হাদিস দুটিতে 'রিবা' নাসিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে।*

---

২৪ কোনো কোনো ফকিহর মতে, শুধু হাদিসে উল্লিখিত ছয়টি পণ্যের ব্যাপারেই 'রিবা ফাদল'-এর সীমা নির্ধারিত। কিন্তু বেশির ভাগ শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞ মনে করেন হাদিসে উল্লিখিত ক'টি পণ্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমজাতীয় যেকোনো পণ্য হাতে হাতে বদলের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, 'রিবা ফাদলে'র বিষয়টি হাদিসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়েছে।

২৫ সুনান আল-বায়হাকি।

২৬ বায়হাকি সূত্রে মিশকাত; মুনতাকা, ইবনে তাইমিয়া।

সুদের ব্যাপারে সাহাবি ও তাবে‘ঈগণের দৃষ্টিভঙ্গি

সাহাবি ও তাবে‘ঈগণ সুদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো লেনদেনে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকলেও তারা তা পরিহার করতেন এবং অন্যদেরও এরূপ লেনদেন করতে নিষেধ করতেন। নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা ও হাদিস থেকে সুদ বর্জনের ব্যাপারে সাহাবি ও তাবে‘ঈগণের সদাসতর্ক মনোভাবের প্রমাণ পওয়া যায় :

আবু বুরদা (রা.) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন : ‘তুমি এমন এক এলাকায় বাস করো যেখানে সুদের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যদি কারো কাছে তোমার ঋণের পাওনা থাকে এবং সে যদি তোমাকে ভূষি, বার্লি, পশুখাদ্য (অর্থাৎ তুচ্ছ জিনিসও) উপঢৌকন দিতে চায় তবে তুমি তা গ্রহণ কোরো না, কারণ তা সুদ।’[২৭]

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বললেন, আমি এক ব্যক্তির কাছ থেকে এই শর্তে পাঁচ শত দিরহাম ঋণ নিয়েছি যে, তাকে আমার ঘোড়াটি বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য দেবো। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, সে যতবার তাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করবে তা হবে সুদ[২৮]। বায়হাকির সুনান গ্রন্থে হজরত উমর ফারুক ও আনাস (রা.) সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[২৯] এসব হাদিস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবিগণের যুগে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের বিপরীতে যেকোনো প্রকারের উদ্বৃত্ত রিবা আন-নাসিয়া হিসেবে পরিগণিত হতো এবং দ্বীনদার লোকদের কাছে অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত না থাকলেও উপঢৌকন বা বাড়তি আদায় করাকে ঘৃণ্য মনে করা হতো এবং সুদের সন্দেহ থেকে দূরে থাকার জন্য তা পরিহার করতেন।

বিশিষ্ট তাবে‘ঈ সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র.) আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরাইরাহ (রা.) খলিফা মারওয়ান (৬২৩-৬৮৫ খ্রি.)-কে বললেন, আপনি কি সুদি কেনাবেচা হালাল করে দিলেন? মারওয়ান বললেন, আমি (এমন) কী করেছি? আবু হুরাইরাহ (রা.) বললেন, আপনি সাকাক (খাদ্যের রেশন কার্ড) বেচাকেনাকে হালাল করেছেন, অথচ রাসূল (স.) খাদ্যসামগ্রী হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, খলিফা মারওয়ান তখন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলেন এবং তা বেচাকেনা করাকে নিষেধ করলেন। সুলাইমান বলেন, (এরপর) আমি দেখলাম যে প্রহরীরা মানুষের হাত থেকে সাকাকগুলো (খাদ্যের রেশন কার্ড) নিয়ে নিচ্ছে।[৩০]

---

২৭ বুখারি, দিল্লি সংস্করণ, ১৩৫৭ হি., ১ম খণ্ড, ১৫৩৮, মানাকিব আবদিল্লাহ ইবনে সালাম।

২৮ বায়হাকি, সুনানুল- কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৩৫১।

২৯ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩০ মুসলিম (শারহ নববী), বৈরুত, দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫, ১০/১৪৬।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আবু হুরাইরাহ (রা.) যখন দেখলেন, কিছু লোক তাদের রেশন কার্ড বিক্রি করছে এবং বাস্তবে কোনো খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যের লেনদেন না হয়ে শুধু কার্ড বেচাকেনার মাধ্যমে কার্ডটি অনেক হাত বদল হচ্ছে, এভাবে কার্ড বিক্রির মাধ্যমে লোকেরা কোনো ব্যবহারযোগ্য পণ্যের বিনিময় ছাড়া শুধু এক খণ্ড কাগজ বেচাকেনার মাধ্যমে একধরনের সুদি কারবার করছে, তখন তিনি সে সময়ের উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও এ জাতীয় সুদি কারবার চালু করার জন্য তাকে দায়ী করেন। খলিফা মারওয়ান সাথে সাথে এ ধরনের লেনদেন বন্ধ করে দেন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এগুলো মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নেন।

বিভিন্ন ধর্মে সুদ

আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর ওপর নাজিলকৃত পবিত্র কুরআনে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, কেবল ইসলামেই সুদ নিষিদ্ধ। কিন্তু এ কথা মোটেও ঠিক নয়; বরং প্রাচীন কাল থেকে দুনিয়ার সব ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ ছিল।

ইহুদি ধর্মে

বনি ইসরাঈলের মধ্যে আল্লাহ বহুসংখ্যক নবী পাঠিয়েছিলেন। এই নবীদের (আ.) কাছে আল্লাহ বেশ ক'টি আসমানি কিতাবও নাজিল করেন। মূসা (আ.)-এর ওপর নাজিল করেছিলেন তাওরাত আর দাউদ (আ.)-এর ওপর নাজিল করেছেন যাবুর। তাঁদের কাছে নাজিলকৃত গ্রন্থে সুদ নিষিদ্ধ ছিল। এ ছাড়া ইহুদিদের সুদি লেনদেন করতে নিষেধ করা হয়েছে; এমনকি ইহুদিদের মধ্যে পরস্পর সুদ লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করা, গ্যারান্টি প্রদান করা, অথবা সাক্ষী হতেও নিষেধ করা হয়েছে। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ Old Testament-এর তিনটি পুস্তকে সুদ নিয়ন্ত্রণকরণ-সংক্রান্ত বিধান পাওয়া যায়; সেগুলো হচ্ছে:

১. 'তোমার ভাই যদি দুঃসময়ে নিপতিত হয়, তাহলে তুমি তাকে বাসস্থান ও আশ্রয় দেবে, সে যদি বিজাতীয় হয় অথবা অতিথি হয় তবুও। তাকে তোমার সাথে বাস করতে দাও। আর তার জন্য যা কিছু ব্যয় করবে তার ওপর সুদ গ্রহণ করবে না। প্রভুকে ভয় করো। তোমার ভাই-এর অধিকার আছে তোমার সাথে বাস করার। তুমি যা খরচ করো বা মাফ করে দাও, তার ওপরে সুদ গ্রহণ করা বৈধ নয়।' *(লেভিটিকাস-এ ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে টারবিট অথবা মারবিট : এর অর্থ হচ্ছে ঋণদাতা কর্তৃক ঋণের ওপর আদায়কৃত সুদ।)*[৩১]

২. 'তোমরা যদি আমার কোনো লোককে অর্থ ধার দাও যারা গরিব, তবে তোমরা তার মহাজন হবে না এবং তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না।'[৩২]

---

৩১ Leviticus 25 : 35-37.

৩২ Exodus -22 : 24.

৩. ‘তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ধার দেবে না; অর্থের সুদ, খাদ্য-সামগ্রীর সুদ এবং অন্য যেকোনো জিনিস, যা সুদে ধার দেয়া হয়, তার সুদ।’[৩৩]

ইহুদিদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর নবী দাউদ (আ.)-কে দেয়া হয়েছিল যাবুর কিতাব। ইহুদিরা এই গ্রন্থকে বলে ‘সামস’। এই গ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪. ‘প্রভু, আপনার তাঁবুতে স্থান পাবে কে? আপনার পবিত্র গিরিতে কে বাস করবে? সে, যে ন্যায় পথে চলে এবং পুণ্যের কাজ করে এবং সর্বান্তকরণে সত্য কথা বলে। যে তার অর্থ সুদে খাটায় না, অথবা নিরীহ নিরপরাধদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে না।’[৩৪]

৫. ‘যেকেউ সুদ এবং অন্যায় উপার্জনের দ্বারা তার সম্পদ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে, সে তা নিজের জন্য পুঞ্জীভূত করে যা দরিদ্রদের দুর্দশা বাড়ায়।’[৩৫]

৬. ‘তারপর আমি বিবেকের সাথে বোঝাপড়া করেছি এবং সম্ভ্রান্তদের ভর্ৎসনা করেছি এবং তাদের নীতিব্যবস্থাকেও এবং তাদের বলেছি, তোমরা জবরদস্তি সুদ আদায় করো তার সব ভাই থেকে এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে এক মহাসমাবেশের ব্যবস্থা রেখেছি।’[৩৬]

বনি ইসরাইলের কাছে প্রেরিত আল্লাহর আর এক নবী ছিলেন যুলকিফল, যাকে এযিকেল বলা হয়। তার কাছে আল্লাহ যে বিধান নাজিল করেন তাতেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কেউ কেউ মনে করেন যুলকিফল একজন আর এযিকেল আর একজন নবী ছিলেন।

৭. ‘যে সুদে ধার দেয় না, অথবা কোনো বৃদ্ধি গ্রহণ করে না, সে অন্যায়পরতা থেকে তার হাতকে সংযত করেছে, সে মানুষে মানুষে সত্য সুবিচার কার্যকর করেছে, সে আমার ছায়ায়/পথে চলেছে এবং সত্যের জন্য আমার সুবিচার রক্ষা করেছে। সে ন্যায়পরায়ণ, সে অবশ্যই বাঁচবে, বললেন সদাপ্রভু।’[৩৭]

৮. ‘এখানে তারা রক্তপাতের জন্য উপঢৌকন গ্রহণ করেছে, সুদ খেয়েছে এবং বৃদ্ধি গ্রহণ করেছে, তারা লোভাতুর ও স্বার্থপর হয়ে প্রতিবেশীদের নির্যাতন করে সম্পদ অর্জন করেছে এবং আমাকে ঋণলে গেছে, বললেন সদাপ্রভু।’[৩৮]

খ্রিষ্টধর্মে

ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবী। খ্রিষ্টানগণ তাকে যিশুখ্রিষ্ট বলে থাকে। খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে কয়েকটি অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

---

৩৩ Deuteronomy -23:19.

৩৪ Psalms- 15:1,2,5.

৩৫ Proverbs- 28:8.

৩৬ Nehemiah- 5:7.

৩৭ Ezekiel- 18:8.

৩৮ Ezekiel- 22:12.

১. ‘না, তোমাদের শত্রুদের অবশ্যই ভালোবাসবে এবং তাদের সাহায্য করবে; এবং তাদের ধার দেবে তবে কোনো বিনিময় নেবে না; আর তোমরা ‘অতি বড়’ পুরস্কার লাভ করবে। আর তোমাদের অবস্থান হবে ‘অতি উচ্চে’। কেননা তিনি বড়ই দয়াশীল, এমনকি, অকৃতজ্ঞ ও পাপীদের প্রতিও।’[৩৯] অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, ‘ধার দাও, তার বিনিময়ে কিছু আশা না করে’।

২. ‘যিশু আল্লাহর ঘর (মাসজিদুল আকসা)-এ প্রবেশ করলেন এবং সেখানে যা কিছু বেচাকেনা হচ্ছিল তা সব বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং অর্থ বিনিময়কারীদের টেবিলগুলো উল্টিয়ে ফেললেন (যারা মানুষের সম্পদ শোষণ করে নিচ্ছিল) এবং বললেন, ‘এটা লিখিত আছে যে, আমার ঘরে ইবাদত করা হবে, কিন্তু তোমরা একে চোরদের আড্ডাখানা বানিয়ে নিয়েছ।’[৪০]

হিন্দু ধর্মে

হিন্দু ধর্মেও সুদ নিষিদ্ধ।

ক. হিন্দু ধর্মে ‘মনু’-এর (২য় শতাব্দী) বিধিমালায় সুদ লেনদেন অবৈধ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

খ. বেদ : বেদে কুষীন্দিনব (সুদখোর) শব্দটি বেশ কয়েকবার উল্লেখ আছে। এর দ্বারা ঋণদাতা কর্তৃক সুদ গ্রহণকে বুঝানো হয়েছে।

গ. সূত্র : এতে বারবার এবং বিস্তৃতভাবে সুদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. বশিষ্ঠ : সে সময়ের একজন প্রখ্যাত হিন্দু আইনপ্রণেতা একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন; এতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জন্য সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে একটি প্রবাদ চালু ছিল যে, ‘নগচ্ছেৎ শুণ্ডিকায়লং’; অর্থাৎ সুদখোরের বাড়িতে যেয়ো না।

বৌদ্ধ ধর্মে

‘জাতাকাস’-এ (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০-৪০০ অব্দ) (বৌদ্ধধর্মে) সুদকে ঘৃণা করা হয়েছে এবং সুদখোরদের ‘ভণ্ড তপস্বী’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

---

৩৯ Gospel of St.Luke- 6:35.

৪০ Gospel of St. Mathew- 21:12-13.

সুদ সম্পর্কে বিখ্যাত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি

সুদ যে মানবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং শোষণের হাতিয়ার তা বিভিন্ন দার্শনিক ও মনীষীর বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কার্ল মার্কস ও জে. এম. কিনসের মতো বিখ্যাত পণ্ডিত সুদকে সমাজ ও অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়ে ক'জন প্রখ্যাত মনীষীর অভিমত নিচে তুলে ধরা হলো :

প্লেটো

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো সুদের নিন্দা করেছেন। সুদকে মানবতাবিরোধী, অন্যায় ও জুলুম এবং কৃত্রিম ব্যবসা বলে তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেছেন।[৪১]

অ্যারিস্টটল

অ্যারিস্টটল বলেন, 'A piece of money cannot beget another piece' বা 'অর্থ কোনো অর্থ সৃষ্টি করতে পারে না।' তার বিবেচনায় অর্থ ধার দিয়ে সুদ আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্য অর্থের ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি সুদকে কৃত্রিম মুনাফা আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'অন্যান্য পণ্যের মতো অর্থ বেচাকেনা করা একটি কৃত্রিম ও জালিয়াতি ব্যবসা।' তিনি আরো বলেন,

''The most hated sort (of wealth), and with the greatest reason, is usury, which makes gain out of money itself and from the natural objects of it. For money was intended to be used in exchange and not increase at interest of all modes of getting wealth, this is the most unnatural.''[৪২]

অর্থাৎ 'সঙ্গত কারণেই সবচেয়ে ঘৃণিত হচ্ছে সুদ যার দ্বারা অর্থ নিজ থেকে অর্থ উপার্জন করে। কারণ অর্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা, সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করা নয়। সম্পদ অর্জনের পন্থা ও পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে অস্বাভাবিক।'

জে. এম. কিনস

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা **জে. এম.** কিনস অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলার জন্য সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে তিনি বলেছেন– এভাবেই পুঁজিবাদী সমাজের অনেক দোষত্রুটি দূর করা সম্ভব। সুদভিত্তিক বিনিয়োগের পরিবর্তে উৎপাদনমুখী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।[৪৩]

---

৪১ প্লেটো, 'লজ', বুক-৫।

৪২ অ্যারিস্টটল, পলিটিক্স, ১২৫৮।

৪৩ J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, Macmillan, Page-166,334,351.

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস সুদের ব্যবসায়ীকে 'বিকট শয়তান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুদখোরকে তিনি তুলনা করেছেন ডাকাত ও সিঁধেল চোরের সাথে।[৪৪]

টমাস একুইনাস

টমাস একুইনাস বলেছেন, 'অর্থ থেকে অর্থের ব্যবহার পৃথক করা যায় না। তাই অর্থ ব্যবহার করা মানে অর্থকে নিঃশেষ বা খরচ করে ফেলা। এ ক্ষেত্রে একবার অর্থের দাম নেয়ার পর পুনরায় অর্থের মূল্য নেয়া হলে, একই পণ্যকে দু'বার বিক্রি করার অপরাধ হবে, অথবা দ্বিতীয়বার এমন জিনিসের দাম নেয়া হবে, যা প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতার দখলে নেই। তাঁর মতে, নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় অবিচার ও জুলুম।'

সুদকে যারা সময়ের মূল্য বলে যুক্তি দেখান তিনি তাদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, 'সময় হলো একটি সাধারণ সম্পদ। এর ওপর ঋণদাতার যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি ঋণগ্রহীতারও অধিকার রয়েছে। এমতবস্থায় ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার কছে সময়ের মূল্য দাবি করা একটা ভণ্ডামি ও অসাধু ব্যবসা।'[৪৫]

মিসাব্যু

ইটালীয় লেখক মিসাব্যু সুদকে অযৌক্তিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, 'এক দিকে অর্থ হচ্ছে একটি প্রতীক মাত্র– এর নিজস্ব কোনো ব্যবহার নেই; অপর দিকে বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের মতো অর্থের কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই।'[৪৬] কাজেই তার মতে, 'অর্থের ওপর সুদ ধার্য করার কোনো যুক্তি নেই।'

জাহেলি যুগে আরবে প্রচলিত রিবা বা সুদের অর্থ ও বিভিন্ন ধরন

সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, হাদিস, বিভিন্ন ধর্ম ও মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পর আমরা সুদ বা রিবা বলতে কী বুঝায় তা আলোচনা করব। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ও রাসূল (স.)-এর হাদিসে সুদকে বুঝাতে আরবি 'রিবা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'রিবা'র আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি, আধিক্য, অতিরিক্ত, স্ফীতি, সম্প্রসারণ ইত্যাদি। 'রিবা' সম্পর্কে পাঁচটি ধাপে পবিত্র কুরআনের ১২টি আয়াত নাজিল হওয়ার সময় 'রিবা'র অর্থ জানার জন্য কোনো ব্যক্তি রাসূল (স.) কে একটিবারও প্রশ্ন করেননি। প্রশ্ন না করার কারণ হচ্ছে, 'রিবা' সম্পর্কে

---

৪৪ ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ২৩-৩২।

৪৫ বোম বাওয়ার্ক, দি পজিটিভ থিওরি অব ইন্টারেস্ট, পৃষ্ঠা– ৩৪।

৪৬ প্রাগুক্ত।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ যখন নাজিল হয় তখন সমাজের সবার কাছে 'রিবা' ছিল অতি পরিচিত। 'রিবা' সম্পর্কে তারা সবাই জানত। হত্যা, চুরি, ডাকাতি, শূকরের মাংস খাওয়া, মদ পান, জুয়া খেলা, যিনা-ব্যভিচার প্রভৃতি পাপকর্ম যেমন সবার কাছে সুপরিচিত ছিল এবং এগুলোর কোনটি দিয়ে কোন বিষয় বা কাজ বুঝায় সে ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না, তেমনি 'রিবা'র ব্যাপারটিও ছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট। আরবরা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 'রিবা' শব্দ ব্যবহার করত। শুধু সে সময়ের আরবরা নয়; বরং তাদের আগের যুগেও অনেক মানুষ তাদের আর্থিক লেনদেনে 'রিবা' নিত এবং দিত। সে যুগে আরবরা 'সুদ' বলতে কী বুঝত এবং সে সমাজে 'রিবা'র প্রচলন কেমন ছিল তা প্রাচীন ও মৌলিক তাফসির গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি। জাহিলি যুগে ঋণের আসলের ওপর বিভিন্নরূপে অতিরিক্ত (অর্থাৎ 'রিবা') ধার্য করার প্রচলন ছিল। নিচে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো :

১. সুদসহ আসল ফেরত দেয়ার শর্তে ঋণদান

প্রথমত ঋণদাতা ঋণ প্রদানের সময়ই তার আসলের ওপর অতিরিক্ত দাবি করত এবং ঋণগ্রহীতা অতিরিক্ত দিতে রাজি হলে ঋণদাতা উক্ত বর্ধিত পরিমাণসহ আসল ফেরতের শর্তে ঋণ দিত। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (মৃত্যু ৩৭০ হিজরি) তাঁর বিখ্যাত তাফসির 'আহকামুল কুরআন'-এ 'রিবা'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

'আরবরা ঋণের আসলের ওপর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ দিত। এটাকেই তারা 'রিবা' বলে জানত এবং এই 'রিবা'র লেনদেনেই তারা অভ্যস্ত ছিল। জাহিলি যুগের 'রিবা' হচ্ছে, কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রদত্ত ঋণের আসলের ওপর ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দেয় নির্ধারিত অতিরিক্ত।'[৪৭]

২. চক্রবৃদ্ধি সুদ

দ্বিতীয়ত ঋণদাতা মাসে মাসে নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত আদায় করত; কিন্তু ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আসলের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত। প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাযি (মৃত্যু-৬০৬ হিজরি) 'আত-তাফসির আল কাবির' গ্রন্থে জাহিলি যুগের 'রিবা' সম্পর্কে বলেছেন :

'জাহিলি যুগে 'রিবা' নাসিয়া সর্বজনে ছিল সুপরিচিত ও স্বীকৃত। অর্থাৎ তারা অর্থ ধার দিত এবং মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত আদায় করত; কিন্তু আসল ঠিক থাকত। তারপর মেয়াদ শেষ হলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে আসল ফেরত চাইত।

---

৪৭ তাফসির আহকামুল কুরআন, আল জাসসাস, খণ্ড-১, লাহোর, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৪৬৫।

ঋণগ্রহীতা আসল ফেরত দিতে অপারগ হলে ঋণদাতা আসলের ওপর বাড়িয়ে দিত এবং মেয়াদও বাড়িয়ে দিত। এটাই হচ্ছে 'রিবা' যা জাহিলি যুগে লোকেরা লেনদেন করত।'[৪৮]

৩. ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর বিনিময়ে সুদ

তৃতীয় যে ধরনটি প্রচলিত ছিল তার বিবরণ দিয়েছেন প্রাচীন তাফসিরকার মুজাহিদ। তিনি উল্লেখ করেছেন, ঋণ প্রদানের সময় ঋণের আসলের ওপর কোনো অতিরিক্ত ধার্য করা হতো না। তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ঋণগ্রহীতা যদি আসল ফেরত দিতে ব্যর্থ হতো, তাহলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে দুটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করত, হয় ঋণগ্রহীতা তখনই আসল ফেরত দেবে; অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি করার বিনিময়ে সে আসলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।

১. পণ্যমূল্য পরিশোধের মেয়াদ শেষে সময় বাড়ানোর বিনিময়ে সুদ

চতুর্থ যে ধরনটি প্রচলিত ছিল তা ইবনে জারির তার বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ তাবারিতে বর্ণনা করেছেন। এটি মূলত তৃতীয় ধরনের মতোই। তিনি বলেছেন :

'জাহিলি যুগের 'রিবা' ছিল এমন এক লেনদেন যেখানে কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতের কোনো নির্ধারিত দিনে দাম পরিশোধ করার শর্তে কোনো পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করত, এরপর দাম পরিশোধের নির্ধারিত তারিখে ক্রেতা যদি দাম পরিশোধে ব্যর্থ হতো, তাহলে বিক্রেতা তার পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিত এবং পরিশোধের জন্য আরো সময় দিত। আল্লামা সুয়ূতি ফারাবির সূত্র থেকে একই কথা বলেছেন : তারা (আরবরা) ভবিষ্যতে দাম পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে পণ্য কিনত, এরপর দাম পরিশোধের নির্ধারিত দিনে বিক্রেতা তার পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে সময়ও বাড়িয়ে দিত।'

এ প্রসঙ্গে ইবনুল আরাবি (মৃত্যু ৫১৪ হিজরি) তার 'আহকামুল কুরআন' নামক তাফসির গ্রন্থে বলেছেন : *'রিবা হচ্ছে সেই বাড়তি দাম, যা কোনো মালের বিনিময় নয়।'*[৪৯] অর্থাৎ পণ্য বিক্রির সময় নির্ধারিত দাম হিসেবে নয়; বরং বাকিতে দাম পরিশোধের শর্তে বিক্রির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় শেষে নতুন কোনো পণ্য বিক্রি না করে দাম পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হলে তা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, জাহিলি যুগে সুদ লেনদেনের বিভিন্ন ধরন ছিল; আর সে সময়ের আরবরা এই সব পন্থাতেই সুদ লেনদেন করত। তবে সব ধরনের সুদি লেনদেনের সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্ছে, দেনার আসলের ওপর একটি অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য

---

৪৮ তাফসির কাবির, ফখরুদ্দীন আল রাযি, (op.cit), খণ্ড-৭, তেহরান, পৃষ্ঠা-৯১।

৪৯ ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৩৬।

করা। কখনো বাকি কেনাবেচা থেকে দেনা সৃষ্টি হতো; কখনো বা ঋণ বা কর্জ থেকে দেনা সৃষ্টি হতো। একইভাবে অতিরিক্ত পরিমাণ কখনো মাসিক ভিত্তিতেও আদায় করা হতো এবং মেয়াদ শেষে আসল ফেরত নিত। কখনো আবার অতিরিক্ত ও আসল মেয়াদ শেষে একত্রে পরিশোধ করা হতো।

এসব ক্ষেত্রেই বর্ধিত অতিরিক্ত অংশকে বলা হতো 'রিবা'; কারণ, 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থই হচ্ছে 'বৃদ্ধি'। অতএব, ঋণচুক্তিতে মূলধনের ওপর যেকোনো বৃদ্ধিই 'রিবা' বা সুদ যা কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'রিবা' বা সুদের প্রকারভেদ

ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী 'রিবা' বা সুদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা: ১. 'রিবা নাসিয়া' ও ২. 'রিবা ফাদল'।

রিবা নাসিয়া

সাধারণত ঋণের ক্ষেত্রে 'রিবা নাসিয়া'র উদ্ভব হয়। ঋণের ওপর সময়ের ব্যবধানের প্রেক্ষিতে পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে 'রিবা নাসিয়া'। ঋণদাতা কোনো অর্থ বা পণ্য ঋণ হিসেবে দেয়ার বিনিময়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সময়ের বিনিময়ে যা কিছু অতিরিক্ত গ্রহণ করে তাকে বলা হয় 'রিবা নাসিয়া'। সহজ ভাষায়, ঋণচুক্তিতে মূলধনের ওপর যেকোনো বৃদ্ধিই হচ্ছে 'রিবা নাসিয়া'। এখানে 'রিবা নাসিয়ার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

উদাহরণ-১ : অর্থ ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে রিবা নাসিয়া

ধরা যাক, ক খ-কে ১০০ টাকা এক বছরের জন্য এই শর্তে ধার দেয় যে, এক বছর পর খ উক্ত ১০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত আরো ২০ টাকা ফেরত দেবে। তাহলে এই অতিরিক্ত ২০ টাকা হবে 'রিবা নাসিয়া'। বর্তমান ব্যাংকিং সুদ এ ধরনের 'রিবা নাসিয়া'র অন্তর্ভুক্ত যা কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উদাহরণ-২ : পণ্য ধার দেয়ার ক্ষেত্রে রিবা নাসিয়া

ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে ১০০ কেজি লবণ এই শর্তে ধার দেয় যে, ছয় মাস পর ঋণগ্রহীতা ১২০ কেজি লবণ ফেরত দেবে, তাহলে এই অতিরিক্ত ২০ কেজি লবণ হবে 'রিবা নাসিয়া'। কাজেই, অর্থ ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে 'রিবা' বা সুদ হতে পারে তেমনি সমজাতীয় পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রেও সময়ের বিবেচনায় অতিরিক্ত নেয়া হলে 'রিবা নাসিয়া' হতে পারে। তবে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কমবেশি করা হলে রিবা হবে না।

উদাহরণ-৩ : পণ্য বাকিতে বিক্রি করার ক্ষেত্রে রিবা নাসিয়া

কারো কাছে বাকিতে পণ্য বিক্রি করার পর নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে বা নিয়ে তার বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ লেনদেন করাও রিবা নাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাকিতে পণ্য বিক্রির সময় (নগদ বিক্রির চেয়ে অপেক্ষাকৃত) বেশি মূল্য নির্ধারণ করা হলে তা সুদ বলে গণ্য হবে না; বরং তা হবে মুনাফা।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে আবি হাতিম সুদ নিষিদ্ধের আয়াত নাজিল হলে মক্কার কাফিরদের আপত্তি– 'বেচাকেনা তো সুদের মতোই'[৫০] সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেছেন : *আমরা বিক্রির সময় বেশি দাম ধার্য করি বা মেয়াদ শেষে পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দেই, কথা একই। উভয়ই সমান। কুরআন মাজিদে উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের এ আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতোই।*[৫১] অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই বাকি বিক্রির সময় নগদের তুলনায় বেশি দাম ধার্য করা সুদ নয়; বরং বাকিতে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা রিবা নাসিয়া। কারণ, এই অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে নতুন কোনো পণ্যের বেচাকেনা নেই। কেবল ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত নেয়া। উল্লেখ্য, রিবা নাসিয়াকে *রিবা আল-কুরআন* (কুরআনে উল্লিখিত রিবা), *রিবা আদ-দুয়ূন* (ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ) ও *রিবা আল-জলি* (প্রকাশ্য সুদ)ও বলা হয়।

রিবা ফাদল

সমজাতীয় দ্রব্য হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে 'রিবা ফাদল'-এর উদ্ভব হয়। কোনো দ্রব্যের সাথে একই জাতীয় দ্রব্য বাড়তি পরিমাণ বিনিময় করলে দ্রব্যের উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবা ফাদল' বলা হয়। নিচে রিবা ফাদল-এর কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

উদাহরণ-১ : সমজাতীয় পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে রিবা ফাদল

যেমন এক কেজি উন্নতমানের খেজুরের সাথে দুই কেজি নিম্নমানের খেজুর বিনিময় করা হলে নিম্নমানের খেজুরের ওই অতিরিক্ত এক কেজিই হবে 'রিবা ফাদল'। উল্লেখ্য, সমজাতীয় দ্রব্য নগদ বিনিময়কালে কমবেশি করা হলে রিবা ফাদলের উদ্ভব হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমজাতীয় পণ্য বিনিময়ে অতিরিক্ত নেয়া বা দেয়াতে রিবা বা সুদ হয় এ বিষয়টি রাসূল (স.) বলার আগে সাহাবিদের জানা ছিল না। তাই তারা নির্দ্বিধায় এরূপ লেনদেন করতেন। কিন্তু

৫০ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৭৫।

৫১ তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম, খণ্ড ২, মক্কা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪৫৪

রাসূল (স.) বলার পরে তারা এরূপ লেনদেন বর্জন করে রাসূল (স.)-এর নির্দেশিত পন্থায় লেনদেন সম্পাদন করেন। রিবা ফাদলকে *রিবা আল হাদিস* (হাদিস দ্বারা চিহ্নিত বিশেষ সুদ), *রিবা আল বুয়ূ* (পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সুদ) ও *রিবা আল-খফি* (অপ্রকাশ্য সুদ)ও বলা হয়।

উদাহরণ-২ : বেচাকেনার ক্ষেত্রে রিবা ফাদল

পণ্য বিনিময় ছাড়াও বেচাকেনার ক্ষেত্রে বাজার সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তিকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণকে সুদ বলে আখ্যায়িত করে রাসূল (স.) একটি হাদিসে বলেছেন, 'কোনো মুসতারসালকে (অর্থাৎ বাজার সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তিকে) ঠকানো 'রিবা' (সুদ)।'[৫২] এ হাদিসের আলোকে বর্তমান যুগের বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. ওমর চাপড়া রিবা ফদলের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : '*Any thing that is unjustifiably received as an extra by one of the two counter parties in a transaction of trading is Riba-al Fadl.*'[৫৩] (অর্থাৎ যা কিছু বেচাকেনা জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হয়, তাই রিবা আল ফাদল।)

বর্তমান যুগে সমজাতীয় পণ্য বিনিময়কালে রিবা ফদলের সীমিত প্রচলন লক্ষ করা যায়। যেমন : ছেঁড়া, ফাটা ও পুরাতন মুদ্রা ও নতুন মুদ্রা বিনিময়কালে কমবেশি করা। পক্ষান্তরে, বর্তমান যুগের ঋণের বিনিময়ে সুদের আদান-প্রদান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ঋণের বিপরীতে প্রচলিত ব্যাংকিং সুদই ব্যাপকভাবে প্রচলিত যা কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' বা সুদের অন্তর্ভুক্ত; এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ব্যাংকিং সুদ ও কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' এক ও অভিন্ন

কারো কারো ধারণা, পবিত্র কুরআনে 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' এবং বর্তমানে ব্যাংকে প্রচলিত সুদ এক নয়। 'রিবা' হলো চক্রবৃদ্ধি সুদ। চক্রবৃদ্ধি সুদকেই ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা সময়ের ব্যবধানে আসলের ওপর বহু গুণে বেড়ে যায়। কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে সুদ ধার্য করা হয়, সে সুদের হার এত বেশি ও উচ্চ নয়। ব্যাংকিং সুদ হচ্ছে সরল সুদ। কাজেই ইসলামে ব্যাংকিং সুদ নিষিদ্ধ নয় বলে তাদের ধারণা।

কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' ও ব্যাংকিং সুদ এক জিনিস নয় এবং 'রিবা' হচ্ছে 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' –এ ধারণাটি ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, 'রিবা'র আভিধানিক অর্থ হলো, বৃদ্ধি, আধিক্য, অতিরিক্ত, স্ফীত, সম্প্রসারণ ইত্যাদি। ঋণের বিপরীতে সময়ের সাথে যেকোনো বৃদ্ধিই হচ্ছে 'রিবা'। 'সুদ' একটি ফারসি শব্দ। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত 'রিবা' শব্দের অর্থ ফারসিতে

---

৫২ সুনান আল-বায়হাকি সূত্রে সুয়ূতি কর্তৃক তাঁর জামি সগির-এ উদ্ধৃত।

৫৩ M. Umer Chapra, The Nature of Riba in Islam. Page-7.

সুদ। বাংলা ভাষায়ও সাধারণভাবে 'রিবা' শব্দের অনুবাদ করা হয় 'সুদ' শব্দ দিয়ে।[৫৪] সুদকে ইংরেজিতে বলা হয় ইউজারি (usury) বা ইন্টারেস্ট (interest)।

Oxford Advanced Learners Dictionary-তে Interest অর্থ বলা হয়েছে, 'Interest (on sth) *(finance)* money charged for borrowing money or paid to sb who invests money; *pay interest/make interest payment on a loan, charge interest @ 10%,* a High/low rate of interest, 'See also compound interest, simple interest'. *[*Interest *(কোনো কিছুর ওপরে) (অর্থ) টাকা ধার করার কারণে টাকা ধার্য করা অথবা কাউকে দেয়া যিনি টাকা বিনিয়োগ করেন;* Interest *দেয়া/ঋণের ওপরে* Interest *পরিশোধ করা। ১০% ইন্টারেস্ট ধার্য করা, ইন্টারেস্টের উচ্চ/নিম্নহার। আরো দেখুন চক্রবৃদ্ধি ইন্টারেস্ট, সরল ইন্টারেস্ট।]* আর usury-এর অর্থ করা হয়েছে, 'The practice of lending money at excessively high rate of interest' *(অত্যন্ত উচ্চহারের Interest –এ অর্থ ধার দেয়ার অনুশীলন)* অর্থাৎ সুদের অত্যন্ত উচ্চহারকে usury বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে interest ও usury দুটোর অর্থই সুদ। তবে পার্থক্য হলো, অত্যন্ত উচ্চহারের সুদ (compound interest)-কে বুঝাতে ইংরেজি usury শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর সরল সুদ (simple interest)-কে বুঝাতে interest শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

সম্ভবত ব্যাংকিং সুদের হার 'অত্যন্ত উচ্চহারের সুদ' নয় –এমন ধারণা থেকে ব্যাংকিং সুদ বুঝাতে usury শব্দের পরিবর্তে interest শব্দটির প্রচলন করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে সুদের উচ্চহার ও নিম্নহার বুঝানোর জন্য কোনো আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কুরআনে সুদ বুঝাতে কেবল 'রিবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর সুদের উচ্চহার বুঝাতে 'রিবা'র সাথে আরেকটি বাক্যাংশ *'আদ্‌'আফাম মুদা'আফা'* যুক্ত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে 'রিবা' শব্দটি আছে এবং *'আদ্‌'আফাম মুদা'আফা'* শব্দ দুটিও আছে। অর্থাৎ একই আয়াতে 'রিবা' ও চক্রবৃদ্ধি দুটিই আছে। সেখানে 'রিবা' দিয়ে সুদ আর *'আদ্‌'আফাম মুদা'আফা'* দিয়ে চক্রবৃদ্ধি (ক্রমবর্ধমান) বুঝানো হয়েছে।[৫৫] অর্থাৎ কুরআনে নিষিদ্ধ সুদের একটি ধরন[৫৬] হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি। উক্ত আয়াতটি সুদ সম্পর্কে তৃতীয়পর্যায়ে নাজিল হওয়া আয়াত। এরপর আরো দুটি পর্যায়ে 'রিবা'র ওপর আয়াত নাজিল হয়েছে যেখানে চক্রবৃদ্ধির উল্লেখ নেই।

'তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না' (৩ : ১৩০) শুধু এ আয়াতের ভিত্তিতে কেবল 'চক্রবৃদ্ধি' সুদ নিষিদ্ধ মনে করা ও চক্রবৃদ্ধি না হলে সুদকে বৈধ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, উক্ত আয়াতে মূলত সুদের মৌলিক ধরন এবং এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

---

৫৪ বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ সম্পাদিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত কুরআনের অনুবাদগ্রন্থ 'আল কুরআনুল কারীম' -এ 'রিবা'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'সুদ'।

৫৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'আল কুরআনুল কারীম'-এ সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতের অনুবাদ।

৫৬ 'রিবা'র অন্যান্য ধরন বিস্তারিত দেখুন "কুরআন-হাদিসে নিষিদ্ধ 'রিবা'র অর্থ" শিরোনামে, পৃষ্ঠা-...।

জাহিলি যুগে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল (এবং বর্তমানের প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায়ও প্রচলিত আছে)। তাই 'চক্রবৃদ্ধি হার' সুদ হারাম হওয়ার কোনো শর্ত নয়, বরং অতিরিক্ত অর্থের ধারণা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। বিষয়টি ঠিক এরূপ, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার আয়াতসমূহ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করো না' (২:৪১)। এখানে 'স্বল্পমূল্য' শর্ত হিসেবে যোগ করা হয়নি, বরং এই ধারণা প্রদানের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আয়াতের বিনিময়ে যে পরিমাণ মূল্যই গ্রহণ করা হোক-না-কেন তা কম হোক আর বেশি উভয়ের হুকুম একই। কাজেই উক্ত আয়াতের এরূপ অর্থ করা নিতান্তই ভুল যে, অধিক মূল্যে কুরআনের আয়াতসমূহ বিক্রি করা যেতে পারে।[৫৭]

এজন্য কুরআন ও হাদিসের বর্ণনার আলোকে এটা প্রমাণিত যে, ব্যাংকিং সুদ ও কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' একই। 'রিবা' বলতে উচ্চহার, নিম্নহার, চক্রবৃদ্ধি, ভোগ্যঋণের সুদ, উৎপাদন ব্যয়ের সুদ, ঋণের ক্ষেত্রে সুদ, পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে সুদসহ সব ধরনের সুদকে বুঝায়।

কারো কারো ধারণা, পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' আর প্রচলিত ব্যাংকিং সুদ এক নয়। তাদের ধারণা, নবী করীম (স.)-এর জামানায় মূলত ভোগব্যয়ের উদ্দেশ্যেই ঋণের লেনদেন হতো। উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন তখন ছিল না। অর্থাৎ কুরআনে কেবল সেই যুগে প্রচলিত ভোগব্যয়ের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সুদ গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই উৎপাদন খাত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নেয়া বর্তমান ব্যাংকিং ঋণের ক্ষেত্রে সুদ নিষিদ্ধ নয়।

এরূপ ধারণা সঠিক নয়। কেননা, সে সময় আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সে সময় ভোগ্যঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণ –এই দুই ধরনের ঋণেরই প্রচলন ছিল। এ-বিষয়ক একটি হাদিস ইমাম বুখারী (র.) উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যায়, এক ইসরাইলি অন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১০০০ দিরহাম ঋণ নিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বের হয়েছিলেন।[৫৮] অর্থাৎ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ ঋণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল।[৫৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় যেমন প্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল, তেমনি ব্যক্তিপর্যায়েও বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল। এ বিষয়ে কুরআন-হাদিস ও ইতিহাসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। কুরআন নাজিলের সমসাময়িককালে আরববাসীদের কাছে বাণিজ্যিক সুদের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল। কাজেই ভোগব্যয়ের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণ ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণ উভয়ই কুরআনের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত ছিল।

---

৫৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৫৮ বুখারি, কিতাব-৩৯, হাদিস নং-২২৯১।

৫৯ ফাতহুল বারি, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৭১। বুখারী, কিতাব-৩৪, অধ্যায়-১০, হাদিস নং-২০৬৩।

ব্যাংকিং সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য

১৯৫৬ সালে মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে শাইখ মাহমুদ সালতুত-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শাইখ আবু জাহরাসহ ৩৫টি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রচলিত ব্যাংকিং সুদকে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়।

পরবর্তীকালে মক্কায় রাবেতা আল্ আলম আল-ইসলামীর ফিক্হ অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

১৯৮৫ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (Islamic Fiqh Academy)-এর উদ্যোগে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ফিকহ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পঁয়তাল্লিশটি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা প্রতিনিধি সম্মেলনটিতে অংশ নেন। পঁয়তাল্লিশটি দেশের প্রায় দুই শ' ওলামা প্রতিনিধি 'ব্যাংকিং সুদ সম্পূর্ণ হারাম'-বিষয়ক ফাতওয়াটিতে স্বাক্ষর করেন।[৬০]

ব্যাংকিং সুদ কি মানবিক

কারো কারো ধারণা, কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা'-এর মধ্যে কোনো ধরনের মানবিক চিন্তা ছিল না। কিন্তু বর্তমান ব্যাংকিং সুদ মানবিক চিন্তার ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ধারণায় এক দিকে কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' দ্বারা চক্রবৃদ্ধি সুদ নিষিদ্ধ করা হয়, যা ছিল অতি উচ্চহারের সুদ এবং তা সময়ের সাথে সাথে বহু গুণে বেড়ে যেত। তাই এটা ছিল অমানবিক। অন্য দিকে সে সময় আরবের গরিব লোকেরা তাদের দৈনন্দিন খাওয়াপরার জন্য একান্ত বাধ্য হয়েই ঋণ গ্রহণ করত। এসব গরিব লোকদের ঋণ দেয়ার পর ঋণের আসলের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা ছিল নিতান্তই অমানবিক ও অন্যায়। তাই পবিত্র কুরআন শুধু এরূপ ক্ষেত্রে 'রিবা' বা সুদ ধার্য করা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু উৎপাদনশীল বাণিজ্যিক ঋণ সাধারণত ধনীরাই নিয়ে থাকে। এ ঋণ তারা তাদের ব্যবসার উন্নয়নে খাটায় এবং এর মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে থাকে। গরিবদের ঋণের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করায় যে বে-ইনসাফি ও অমানবিকতা দেখা দেয়, এসব উৎপাদনশীল বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে তেমন বে-ইনসাফি ও অমানবিকতা নেই। তাই তাদের ধারণায় বর্তমান ব্যাংকিং সুদ অমানবিক না হওয়ায় তা হারাম নয়।

তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ- প্রথমত, কুরআনে 'রিবা' দ্বারা কেবল অতি উচ্চহারের সুদ বুঝানো হয়নি তা আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া ভোগব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের ওপর সুদ অমানবিক হওয়া আর বাণিজ্যিক ঋণের ওপর সুদ মানবিক

---

৬০ ইসলাহী খুতুবাত (বিচারপতি মুফতি তকি উসমানী-এর বক্তৃতা সঙ্কলন), ৭ম খণ্ড, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ উমাইর কোব্বাদি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১০, দারুল উলুম লাইব্রেরি, ঢাকা, পৃ:১০০-১০১।

হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত বিবেচনায় যথার্থ নয়। কেননা, পবিত্র কুরআনে সুদ সম্পর্কে যেসব আয়াত এসেছে সেখানে ঋণগ্রহীতার সামর্থ্য কিংবা ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সুদের কোনো শ্রেণিবিভাগ করা হয়নি। ফলে সব ধরনের সুদই হারাম। ব্যাংকিং সুদ ও মহাজনি সুদ, ভোগব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের সুদ ও ব্যবসার জন্য নেয়া ঋণের সুদ এবং গরিবদের ঋণের সুদ ও ধনীদের ঋণের সুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অন্য দিকে ইসলামে যেসব লেনদেনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাও করা হয়েছে লেনদেনের নিজস্ব প্রকৃতির ভিত্তিতে, ক্রেতা-বিক্রেতার আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নয়। ঘুষ, জুয়া প্রভৃতি ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার জন্য হারাম। আসলে লেনদেনকারীর সামর্থ্য কিংবা লেনদেনের উদ্দেশ্য উক্ত লেনদেনকে বৈধ বা অবৈধ বানায় না; বরং লেনদেনের নিজস্ব প্রকৃতিই এর বৈধতা বা অবৈধতা সাব্যস্ত করে।

ইসলামী শরী'আহর বিধান মোতাবেক সুদ যদি প্রকৃতিগতভাবে বৈধ হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতা গরিব হলেও তার ওপর সুদ আরোপ করা বৈধ হবে। কিন্তু নিজস্ব প্রকৃতির কারণে যদি সুদি কারবার অবৈধ হয়, তাহলে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা ধনী বা গরিব যা-ই হোক সুদ ধার্য করা অবৈধ হবে। একইভাবে কেনাবেচা বা ব্যবসা প্রকৃতিগতভাবে হালাল হয়ে থাকলে ক্রেতা ধনী হলেও তার ওপর মুনাফা ধার্য করা যেমন বৈধ, তেমনি ক্রেতা গরিব হলেও তা বৈধ হবে। লেনদেনকারী ধনী হোক বা গরিব হোক তাতে কিছু আসে যায় না। যেমন বাসা ভাড়া দেয়া একটি বৈধ লেনদেন এবং ভাড়াগ্রহীতা যদি গরিব হয় তবুও তার কাছ থেকে বাসার ভাড়া নেয়া বৈধ। তবে এতটুকু হয়তো বলা যেতে পারে যে, যেহেতু ভাড়াগ্রহীতা গরিব তাই মানবিক কারণে তার কাছ থেকে ভাড়া কিছুটা কম আদায় করলে তা তার প্রতি ইহসান হবে। কিন্তু কেউ একথা বলতে পারে না যে, তার কাছ থেকে ভাড়া গ্রহণ করা হারাম কিংবা অমানবিক। আসলে কুরআন ও হাদিসে ঋণের উদ্দেশ্য কিংবা ঋণগ্রহীতার আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে ভোগব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের সুদ এবং বাণিজ্যিক বা ব্যাংকিং সুদের মধ্যে বিধানের কোনো ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়নি; বরং সুদ মাত্রই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভোগব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের সুদ অমানবিক আর ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণ বা বর্তমান ব্যাংকিং সুদ মানবিক হওয়ার দাবি অমূলক। কেননা, ব্যাংক থেকে ভোগব্যবহারের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণ এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংকিং সুদ আরোপ করা হয়। একজন গরিব ব্যবসায়ী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন আবার একজন ধনী গ্রাহকও তার বিলাসিতার জন্য ভোগ্যঋণ গ্রহণ করতে পারেন। তাই কোনো ধরনের সুদই মানবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সুদ মাত্রই শোষণের হাতিয়ার।

সুদের বহুমাত্রিক ক্ষতি

ব্যাংকিং সুদ তো মানবিক নয়ই; বরং মানবজীবনে সুদের কুফল সর্বব্যাপী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুগে যুগে সুদকে মানবতার জন্য ঘৃণ্য শত্রু, ক্ষতিকর ও পরিত্যাজ্য বলে গণ্য করা

হয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বজুড়ে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দা এই সুদেরই অনিবার্য ফল। সুদের অসংখ্য কুফলের মধ্যে ক'টি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সুদের অর্থনৈতিক কুফল

সুদভিত্তিক পদ্ধতির দুর্বলতার কারণে প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় মানুষ নানা রকম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে এর কুপ্রভাব সর্বব্যাপী। এ ধরনের কয়েকটি ক্ষতি হচ্ছে :

ক. সম্পদ অল্প কিছু লোকের হাতে জমা হয়

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ধীরে ধীরে অল্প কিছু ধনী মানুষের হাতে জমা হতে থাকে এবং সমাজের বেশির ভাগ মানুষ ধীরে ধীরে গরিব থেকে আরো গরিব হতে থাকে।

খ. সুদ বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়

সুদের হারের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। কারণ, সুদের হার বাড়ার কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং বিনিয়োগ কমতে থাকে। ফলে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয় না।

গ. সুদ ক্ষতিকর ও বিলাসদ্রব্যে বিনিয়োগ বাড়ায়

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় অর্থ বিনিয়োগকারীরা বেশি মুনাফার সম্ভাবনা থাকলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্য যেমন : হেরোইন, মদ, গাজা ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য, পর্ণোগ্রাফি, অশ্লীল সিনেমা তৈরি প্রভৃতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে। এসব পণ্য সমাজের জন্য ক্ষতিকর হলেও বেশি মুনাফার সম্ভাবনা থাকায় অর্থ বিনিয়োগকারীরা এসব খাতে বিনিয়োগ করে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য উৎপাদনেও তারা বিনিয়োগ করে থাকে।

ঘ. প্রয়োজনীয় কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ কমে যায়

প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় উচ্চ হারে সুদ পরিশোধের শর্তে উৎপাদনকারীরা ঋণগ্রহণ করে। তাই তারা সব অবস্থায় বেশি লাভজনক এবং ঝুঁকিবিহীন ও নিরাপদ খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়। এ কারণে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু কম লাভজনক কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ এমন খাতে বিনিয়োগ কমে যায়।

ঙ. উৎপাদন কমিয়ে দেয়

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় একজন উৎপাদনকারী পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার সমান হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন চালিয়ে যায়। কিন্তু সুদের হার কখনো শূন্য হয় না বলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত আরো যে উৎপাদন হতে পারত, এ ব্যবস্থায় তা হয় না। কাজেই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে না।

চ. অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ

সুদিব্যবস্থায় ঝুঁকিমুক্ত, নিশ্চিত ও নির্ধারিত সুদ লাভের সুযোগ থাকায় পুঁজির মালিকেরা তাদের অর্থের বড় একটি অংশ সরকারি সিকিউরিটিজ, শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। ফলে প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ কমে যায়।

ছ. সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের ওপর সুদের নেতিবাচক প্রভাব

সামগ্রিক ভোগ বাড়লে বিনিয়োগ ও আয় বাড়ে। আবার আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে। কিন্তু, সুদের হার বাড়লে উৎপাদন খরচ বাড়ে। ফলে পণ্যের বাজারমূল্যও বেড়ে যায়। এ কারণে মোট বিক্রিও কমে যায়। আর বিক্রি কমে যাওয়ার কারণে উৎপাদনকারীর আয় ও সঞ্চয় কমে যায়। ফলে বিনিয়োগও কমে যায়। এভাবে সুদ সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

জ. জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়

অর্থনীতিতে সুদের হারকে বিবেচনায় রেখে জিনিসপত্রের দাম নির্ধারিত হয়। ফলে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক বেশি হয়।

ঝ. ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সুদের হারের কারণে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। ফলে একই পরিমাণ পণ্য কিনতে বা সেবা গ্রহণ করতে গেলে মানুষের আগের চেয়ে বেশি টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু তাদের আয় সে হারে বাড়ে না। ফলে সমাজের নিম্ন আয়ের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। এ কারণে তীব্র চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্যের অভাবে ভোক্তারা পণ্য কিনতে পারে না।

ঞ. বেকারত্ব বাড়ে ও আয় কমে

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সুদের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক বিপরীতমুখী অর্থাৎ, সুদের হার বেড়ে গেলে বিনিয়োগ কমে যায়। আর বিনিয়োগ কমলে কর্মসংস্থানও কমে যায়। এ কারণে বেকারত্ব বেড়ে যায়। ফলে কর্মসংস্থানের অভাবে শ্রমিকেরা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। এ কারণে তাদের আয় কমে যায়।

ট. মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে

সুদের হার বাড়লে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি পরিমাণ ঋণ দেয়। এতে বাজারে অর্থের সরবরাহ বেড়ে যায়। অন্য দিকে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যাপক ঋণ প্রদানের কারণেও বাজারে অর্থসরবরাহ বেড়ে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে বাজারে পণ্যের তুলনায় অর্থের জোগান বৃদ্ধি পায় ও মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

ঠ. জাতীয় আয় কমে

সাধারণত সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে। আর বিনিয়োগ বাড়লে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় বাড়ে। সুদের হার শূন্য হলে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয়। ফলে জাতীয় আয়ও সবচেয়ে বেশি হয়। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের উচ্চহারের কারণে বিনিয়োগ কম হয় বলে মোট জাতীয় আয় কমে যায়।

ড. অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি

সুদের কারণে অর্থনীতিতে মারাত্মক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পরিণতিতে তা অর্থনীতিকে মন্দার দিকে ঠেলে দেয়। কারণ, সুদের হার কমে গেলে পণ্যের মূল্যও কমে। ফলে বাজারে পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। এ কারণে উৎপাদনকারী বেশি মুনাফার আশায় বেশি বিনিয়োগে উৎসাহী হন ও বেশি পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেন। এ সুযোগে পুঁজির মালিক সুদের হার বাড়িয়ে দেন। ফলে উৎপাদনব্যয় বেড়ে যায় এবং উৎপাদনকারীর মুনাফা কমে যায়। আবার পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে বিক্রি কমে যায় এবং বহু পণ্য অবিক্রীত থাকে। ফলে চড়া সুদে প্রদত্ত ঋণ ফেরত পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা অর্থনীতিতে একধরনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে বলে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়।

নৈতিক চরিত্রের ওপর সুদের কুপ্রভাব

সুদ মানুষের নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করে। সুদ মানুষের বিবেককে কলুষিত করার মাধ্যমে তাদেরকে চরম অর্থলিপ্সু ও কৃপণ করে তোলে। মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অনুভূতিকে নষ্ট করে দেয়।

সুদের সামাজিক কুফল

সুদি অর্থব্যবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ ধীরে ধীরে ধনীর কুক্ষিগত হয়। সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ে। আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ঋণের সুদ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়। সুদসহ আসল আদায় না হওয়া পর্যন্ত তা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় ঋণগ্রহীতারা সুদের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে সে রিক্ত, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়। দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের সুদের দেনা পরিশোধের জন্য ভিটেমাটি পর্যন্ত

বিক্রি করতে হয়–এমন ঘটনা সুদিব্যবস্থায় প্রায়ই দেখা যায়। ফলে সুদ মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

প্রকৃতপক্ষে সুদের অভিশাপে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সুদ সম্পদ-বণ্টন প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সম্পদ ও দায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা বাড়িয়ে তোলে। এটি সামাজিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। জনগণের স্বভাব-প্রকৃতি, চাহিদা, তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিপন্থী এ ব্যবস্থা মানবজাতির জন্য বহু অকল্যাণের জন্ম দিয়েছে। আধুনিক দুনিয়ায় ব্যাংকব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সুদ সমাজে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে দ্রুত বাড়িয়ে তুলছে। সম্পদ ও দায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা পালন করছে দক্ষ ও কুশলী ভূমিকা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুদের গুরুভার কঠিন দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুদের এ অভিশাপ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোও বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণের স্বভাব-প্রকৃতি, চাহিদা, তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিপন্থী এ ব্যবস্থা মানবজাতির জন্য বহু অকল্যাণের জন্ম দিয়েছে।

আর তাই আধুনিক পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের বিকাশের অনেক আগে ইসলাম সুদের অপকারিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থিত করেছে। সুদকে আল-কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে উচ্চারণ করা হয়েছে যুদ্ধের ঘোষণা।

সুদ বনাম ইসলামী ব্যাংকিং

সুদ নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে ইসলাম আর্থিক লেনদেনের হালাল বিকল্প নীতি ও পদ্ধতির নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের এ নির্দেশনার আলোকে আর্থিক ক্ষেত্রে সুদ বর্জন করে শরী'আহ্সম্মত বিভিন্ন হালাল ব্যবসাপদ্ধতি অনুসরণ করছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কোনো লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করা হয় না। বেচাকেনা পদ্ধতি ও লাভ-লোকসানে অংশীদারি পদ্ধতি ও সম্পদ ভাড়াদান পদ্ধতিসহ ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইসলামী বিনিয়োগব্যবস্থার ফলে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রচলন সুদের পাপ ও শোষণ থেকে মুক্ত করে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং এর মধ্যে পার্থক্য

কারো কারো ধারণা, সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং আসলে একই; ইসলামী ব্যাংক একটু ঘুরিয়ে খায়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, ব্যাংকিং সেবাদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল

রয়েছে; আবার নীতি-আদর্শের ভিন্নতার কারণে দুইটি পদ্ধতির মধ্যে বহু পার্থক্যও রয়েছে। যেমন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে মানুষ হিসেবে বহু মিল রয়েছে; আবার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শিক বিবেচনায় তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের কিছু পার্থক্য এখানে তুলে ধরা হলো।

নীতি ও আদর্শগত পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল থাকলেও নীতি ও আদর্শগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. **উদ্দেশ্যগত পার্থক্য :** ইসলামী শরী'আহ্‌র কতগুলো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে যাকে মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ বলে। ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্‌র সে সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক মূলত এর মালিকদের পুঁজি বাড়ানোর জন্যই কাজ করে থাকে।

খ. **বিনিয়োগপদ্ধতির ভিন্নতা :** জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের পদ্ধতিগত ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা ও আল ওয়াদিয়ার ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করে এবং মুদারাবা, মুশারাকা, বাই বা বেচাকেনা, ইজারা ইত্যাদি শরী'আহ্‌সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে। অন্য দিকে, প্রচলিত ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে জমাগ্রহণ ও ঋণদান করে থাকে।

গ. **শরী'আহ্ পরিপালন :** ইসলামী ব্যাংক তার কার্যক্রমের সবপর্যায়ে ইসলামী শরী'আহ্‌র বিনিনিষেধ পরিপালন করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকে সেসব বিধিনিষেধ মেনে চলার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

ঘ. **ব্যাংক ও গ্রাহকের ঝুঁকি গ্রহণ :** মুদারাবা জমাকারীদের অর্থ বিনিয়োগ করে ইসলামী ব্যাংক কোনো লোকসানের সম্মুখীন হলে জমাকারীগণ সে লোকসান বহনের ঝুঁকি নেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকের জমাকারীগণ এ ধরনের কোনো ঝুঁকি নেন না। অন্য দিকে মুশারাকা, মুদারাবা প্রভৃতি পদ্ধতির বিনিয়োগ গ্রাহকগণ ব্যবসায়ে লোকসানের সম্মুখীন হলে ইসলামী ব্যাংক নিয়মানুযায়ী সে লোকসান বহনের ঝুঁকি নেয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক তা করে না।

ঙ. **গ্রাহক-ব্যাংক সম্পক :** ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক সাহিবুল মাল ও মুদারিব, মু'দা ইলাইহি ও মু'দিয়, ক্রেতা ও বিক্রেতা, কারবারের অংশীদার কিংবা ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার। আর প্রচলিত ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার প্রধান সম্পর্ক হয় ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার।

চ. **মূলধনের ব্যবহার :** ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাই পদ্ধতি সরাসরি পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে এখানে এক খাতের তহবিল অন্য খাতে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ কম।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকে অর্থ ঋণ দেয়া হয় বলে সেখানে এক খাতের তহবিল অন্য খাতে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ বেশি।

ছ. **বিনিয়োগপদ্ধতির বৈচিত্র্য :** ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বহু ধরনের বিনিয়োগপদ্ধতি রয়েছে। ইজতিহাদের ফলে দিন দিন এর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ঋণদানের পদ্ধতি সীমিত এবং নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সুযোগও কম।

জ. **প্রকল্প মূল্যায়ন :** কোনো প্রকল্প কতটা সফল ও লাভজনক হবে তা মূল্যায়ন করার ওপর ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। অন্য দিকে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের চেয়ে সহায়ক জামানতের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

ঝ. **যাকাত প্রদান :** ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব যাকাতযোগ্য তহবিলের ওপর প্রতি বছর যাকাত দেয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকে যাকাত প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই।

পদ্ধতিগত পার্থক্য

প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে নীতি ও আদর্শগত পার্থক্যের পাশাপাশি কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্যও নিচে উল্লেখ করা হলো।

প্রচলিত ব্যাংক সুদভিত্তিক	ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত
১. ঋণচুক্তিতে মূলধনের ওপর যেকোনো বৃদ্ধিই 'রিবা' বা সুদ (Any additional amount over the principal in a contact of loan is Riba)। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থ ঋণ দিয়ে তার ওপর নির্ধারিত সুদ অর্জন করা হয়।	১. বেচাকেনা বা ব্যবসায়িক চুক্তিতে মূলধনের ওপর যেকোনো বৃদ্ধিই 'রিবহ' বা মুনাফা (Any additional amount over the principal in a contact of trade is profit)। ইসলামী ব্যাংক বেচাকেনা, ভাড়া, অংশীদারি ইত্যাদি চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে তার ওপর মুনাফা অর্জন করে।
২. প্রচলিত ব্যাংক অর্থ জমা গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনে নিষিদ্ধ 'সুদ' প্রদান করে থাকে।	২. ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্ অনুমোদিত মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে অর্থ জমা গ্রহণ করে এবং জমাকারীকে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাত অনুযায়ী প্রদান করে থাকে।
৩. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থ জমাকারীকে কোনো লোকসান বহন করতে হয় না। সব অবস্থায় ব্যাংক অর্থ জমাকারীকে নির্ধারিত সুদসহ মূলধন ফেরত দিতে বাধ্য।	৩. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বাস্তবে লোকসান হলে অর্থ জমাকারীকে তা বহন করতে হয়। অবশ্য কোনো কোনো খাতে লোকসান হলেও সামগ্রিকভাবে ব্যাংক লাভ করায় সাধারণভাবে অর্থ জমাকারীগণ লোকসান বহনের বিষয়টি দেখতে পারেন না।

৪. প্রচলিত ব্যাংক অর্থ ঋণ দিয়ে তার ওপর নির্ধারিত ‘সুদ’ গ্রহণ করে থাকে।	৪. ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত লাভে পণ্য বিক্রিসহ অন্যান্য শরী‘আহ্ অনুমোদিত ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রয় করে তার ওপর মুনাফা গ্রহণ করে।
৫. প্রচলিত ব্যাংক মানি মার্কেট থেকে টাকা ঋণ দেয়ানেয়ার ক্ষেত্রে কুরআনে নিষিদ্ধ ‘সুদ’ গ্রহণ ও প্রদান করে থাকে।	৫. ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত মানি মার্কেট থেকে ঋণ গ্রহণ ও প্রদান করে না বরং মুদারাবার ভিত্তিতে আন্তঃইসলামী ব্যাংক ফান্ড মার্কেটে অর্থ আদান-প্রদান করে।
৬. প্রচলিত ব্যাংক নির্ধারিত সুদে বাজারে বন্ড ইস্যু করে থাকে।	৬. ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক বন্ড ইস্যু করে না।
৭. প্রচলিত ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে ‘সুদ’ প্রদান করে থাকে।	৭. ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে ফিক্সড ডিপোজিট গ্রহণ করে চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে মুনাফা প্রদান করে।
৮. প্রচলিত ব্যাংকে ঋণ (Loan) শব্দটির প্রচলন ও অনুশীলন হয়।	৮. ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ (Investment) শব্দটির ব্যবহার ও অনুশীলন হয়।

পণ্য বেচাকেনা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য

আরবের কাফির-মুশরিকেরা বলত ‘বেচাকেনা তো সুদের মতো’। এখনো অনেকে ভালোভাবে না জানার কারণে একই কথা বলে থাকেন। অথচ পণ্য বেচাকেনা ও সুদ এক জিনিস নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন, ‘এটা (সুদখোরদের শাস্তি) এ কারণে যে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতোই, অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম।’ পণ্য বেচাকেনা ও সুদের মধ্যের কয়েকটি পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. পণ্য বেচাকেনা হালাল আর সুদ হারাম।
২. পণ্য বেচাকেনায় লাভের সাথে সাথে লোকসানও আছে। সুদের মধ্যে কোনো লোকসানের সুযোগ নেই।
৩. বেচাকেনায় ক্রেতা ও বিক্রেতা পণ্য ও অর্থ বিনিময় করে মুনাফা পায় মাত্র একবার। কিন্তু সময় বাড়িয়ে দিয়ে একাধিকবার সুদ আরোপ করা বা সুদ বাড়িয়ে নেয়া যেতে পারে।
৪. বেচাকেনাকারীর শ্রম, চিন্তা, বুদ্ধি ও সময় ইত্যাদি ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে সময় পার হয় মাত্র; অন্য কোনো পরিশ্রম নেই।
৫. বেচাকেনার সম্পর্ক পণ্যের সাথে আর সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।
৬. বেচাকেনার ক্ষেত্রে কখনো মুনাফা হয়, কখনো লোকসান হয় আবার কখনো মুনাফা বা লোকসান কোনোটাই হয় না। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সব সময় অতিরিক্ত পেয়ে থাকে, কখনো লোকসান বহন করে না।

মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামের দৃষ্টিতে 'সুদ' (interest) হারাম ও মুনাফা হালাল। প্রচলিত ব্যাংক সুদ দেয় ও সুদ নেয়, কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে সুদ বর্জন করা হয় এবং সুদের পরিবর্তে মুনাফা দেয়া ও নেয়া হয়। সুদ ও মুনাফার মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. কাউকে ঋণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর ঋণের শর্তের আলোকে পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হয় তাকে সুদ বলে। অন্য দিকে, পণ্যের বিক্রিমূল্য ক্রয়মূল্য থেকে বেশি হলে উক্ত বর্ধিত অর্থপ্রাপ্তিকে মুনাফা বলে ।

খ. সুদ পূর্বনির্ধারিত হারে পাওয়া যায়। ফলে, এর ক্ষেত্রে ঋণদাতার ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। কিন্তু পণ্য বিক্রি শেষে মুনাফা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ নগদ অর্থকে প্রথমে পণ্যে রূপান্তর করা হয় এবং এরপর পণ্যকে আবার নগদ অর্থে রূপান্তর করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় মুনাফা হয়ে থাকে।

গ. সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সব সময় 'বাড়তি' পেয়ে থাকে, তার কখনো লোকসান হয় না। কারণ, অতিরিক্ত দেয়ার শর্তেই সে ঋণ দেয়। কিন্তু মুনাফা অনিশ্চিত। কেনাবেচা বা ব্যবসায়ের মাধ্যমে কখনো মুনাফা হয়, কখনো লোকসান হয় আবার কখনো মুনাফা বা লোকসান কোনোটাই হয় না।

ঘ. সুদের সম্পর্ক অর্থসম্পদ ও সময়ের সাথে। আর মুনাফার সম্পর্ক ব্যবসা কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।

ঙ. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

চ. ঋণদাতা ঋণের ওপর একাধিকবার সুদ ধার্য করতে পারে। কিন্তু মুনাফা শুধু একবারই আরোপ করা যায় ।

ছ. সুদ বিনা শ্রমে পাওয়া যায়। এতে কোনো ঝুঁকি নেই। কিন্তু মুনাফা অর্জনে পরিশ্রম করতে হয়। শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে মুনাফা পাওয়া যায়। এতে ঝুঁকি আছে।

জ. সুদের ক্ষেত্রে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তার কোনো বিনিময় দেয়া হয় না। পক্ষান্তরে, মুনাফা অর্জনে পণ্য বিনিময় করা হয়।

উপসংহার

সুদ শোষণের হাতিয়ার বিধায় ইনসাফের ধর্ম ইসলামে তা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তার যাত্রা শুরু করেছিল মানবতার জন্য ক্ষতিকর সুদ বর্জন করে ও ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণনীতির ওপর ভিত্তি করে। এ ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের আগ্রহ ও আস্থার প্রতীকে পরিণত হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা কেবল সুদমুক্ত বা বিশেষ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন ব্যাংকব্যবস্থা নয়; বরং মানবজাতির জন্য তা একটি উত্তম ও অধিকতর টেকসই সমাধান।

রিবা ও ইসলামী ব্যাংকিং

আবু ওমর ফারুক আহমেদ এবং এম কবির হাসান[১]

সারমর্ম

রাসূল (স.) তার বিদায় হজের ভাষণে সব ধরনের 'রিবা' সম্পর্কে সাবধান করেছেন। এই নিবন্ধে 'রিবা'র নীতিমালা এবং রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধান মেনে ইসলামী অর্থনীতির পরিসীমায় এটি আদৌ খাপ খায় কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বর্ণনা এবং মহানবী (স.)-এর হাদিসের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক কালের কিছু মানুষ বিতর্ক সৃষ্টির জন্য বলেন, আল-কুরআনে যে ধরনের 'রিবা'র কথা বলা হয়েছে তা আসলে ইসলাম-পূর্ব যুগের সমাজে প্রচলিত একধরনের 'ধার প্রদান' পদ্ধতি। এই নিবন্ধে তাদের বক্তব্য পুরোপুরি বাতিল করে যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, 'আসল'-এর ওপর যেকোনো হ্রাস-বৃদ্ধিই হলো 'রিবা' এবং তা নিষিদ্ধ। আধুনিকতাবাদীরা 'রিবা ও ইউজারি'র মধ্যে পার্থক্য এবং 'ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রিবা' এমন কিছু বিতর্কিত ইস্যুও তুলে ধরেন। শরী'আহ্ বিধির পর্যাপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপরিউক্ত দাবিগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। এ নিবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সহজাত সৌন্দর্য তুলে ধরার পাশাপাশি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এখানে সবেচেয়ে বেশি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যেকোনো ধরনের 'রিবা' কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে হবে।

১. সূচনা

বিদায় হজের সময় দেয়া বিশ্বনবী মোহাম্মদ (স.)-এর ভাষণ মানবজাতির জন্য একটি 'ম্যাগনাকার্টা'। অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী এই ভাষণ ছিল নবী (স.)-এর আজীবন প্রচারিত ইসলাম ধর্মের নির্যাস। তিনি মূলত তিনটি মৌলিক বিষয় এই ভাষণে তুলে ধরেছেন : ক. এক আল্লাহর ওপর মৌলিক বিশ্বাস; খ. আইনের শাসন ও নৈতিকতা; গ. ন্যায়ের শাসন। তিনি

১ **ড. আবু ওমর ফারুক আহমেদ** ইন্টারন্যাশনাল শরী'আহ্ রিসার্চ অ্যাকাডেমি ফর ইসলামিক ফিন্যান্স (আইএসআরএ)-এর সিনিয়র গবেষক; চেয়ারম্যান, শরী'আহ্ অ্যাডভাইজরি বোর্ড অব ইসলামিক কো-অপারেটিভ ফিন্যান্স অস্ট্রেলিয়া লি.; চেয়ারম্যান, অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টার ইনক্; ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এক্সিলেন্স ইন ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এ ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়নবিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাপত্রের সঙ্গে যুক্ত।

ড. এম কবির হাসান ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক অ্যান্ড ফিন্যান্স, ইউনির্ভাসিটি অব নিউ অর্লিন্স-এর অধ্যাপক, যুক্তরাষ্ট্র; ফিন্যান্সিয়াল ইকোনমিস্ট, উন্নয়ন অর্থনীতি, অর্থ ও পুঁজিবাজার, ইসলামী অর্থায়ন, করপোরেট ফিন্যান্স, বিনিয়োগ, সামষ্টিক অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ।

‘রিবা’কে হারাম ঘোষণা করে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পাশাপাশি, জীবন, সম্পদ ও সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা ঘোষণা করেন। বিদায় হজের ভাষণে সুদের ব্যাপারে নবী (স.) বলেন : “আল্লাহ তোমাদেরকে ইউজারি (সুদ) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন; তাই এখন থেকে সব ঋণের দায়মুক্তি ঘোষণা করা হলো। তোমাদের সম্পদ তোমাদের কাছে থাকবে। তোমরা কারো সঙ্গে অন্যায় করবে না এবং তোমাদের সঙ্গেও অন্যায় করা হবে না। কোনো সুদ থাকবে না বলে আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।” এই নিবন্ধে ‘রিবা’র নীতিমালা এবং কিভাবে তা ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে সুচারুভাবে মেনে চলা যায় তা দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারে নবী (স.)-এর সুন্নাহ এবং পবিত্র কুরআনের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

২. রিবা : শরী‘আহ্ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা

‘রিবা’ আরবি শব্দ। এর ক্রিয়া রূপ ‘রাবা’, যার শাব্দিক অর্থ ‘বেড়ে ওঠা’ বা ‘সম্প্রসারণ’ বা ‘বৃদ্ধি’ বা ‘স্ফীত হওয়া’ বা ‘অতিরিক্ত’।[২] এই সবগুলো অর্থেই আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ‘রিবা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] তবে যেকোনো ‘বেড়ে ওঠা’ বা ‘বৃদ্ধি’ ইসলামে বর্ণিত ‘রিবা নিষিদ্ধে’র আওতায় পড়ে না। একে সাধারণভাবে ইংরেজিতে ‘ইউজারি’ বা ‘সুদ’ হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু শরী‘আহ্য় ‘রিবা’র অর্থ আরো ব্যাপক। শরী‘আহ্য় কৌশলগতভাবে ‘রিবা’ বলতে ‘প্রিমিয়াম’কে বুঝানো হয়েছে। এই প্রিমিয়াম হলো তাই, যা ঋণদাতাকে আসল অর্থের সঙ্গে অবশ্যই ঋণগ্রহীতা পরিশোধ করেন। এটা ঋণ পাওয়া বা ঋণ পরিপক্ক হওয়ার পর সময় বাড়ানোর একটি শর্ত।[৪] ফিকাহ্ শাস্ত্রের[৫] পরিভাষায় ‘রিবা’ হলো দুটি সমরূপ জিনিস লেনদেনের ঘটনায় এর একটি প্রত্যাবর্তনকালে যখন মূলের ওপর বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে।[৬] শরী‘আহ্য় দুটি অর্থে ‘রিবা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত ‘রিবা আল-নাসিয়াহ’ এবং দ্বিতীয়ত : ‘রিবা আল-ফাদল।’[৭] কিছু মুসলিম পণ্ডিত ‘রিবা’ শব্দের সংজ্ঞা এমনভাবে

---

২ আল-রাজিব আল ইস্ফাহানি, আল-হুসাইন, Al-Mufradat Fi Gharaib Al-Qur'an, কায়রো, ১৯৬১, পৃ: ১৮৬-১৮৭। ক্লাসিক্যাল আরবি অভিধানগুলোতে সর্বসম্মতভাবে এই অর্থটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল-কুরআনের ভাষ্যেও একই কথা বলা হয়েছে।

৩ আল-কুরআন, ৩০:৩৯; ২৩:৫০; ২:২৬৫, ২৭৬।

৪ চাপড়া, এম. উমর, Towards a Just Monetary System, লিচেস্টার, ১৯৮৬, পৃ: ৫৬-৫৭।

৫ প্রাথমিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ এবং পরবর্তীতে ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম আইনশাস্ত্র।

৬ আল-জাজিরি, আবদাল-রাহমান, Kitab al-Fiqh `ala al-Madhahib al-`Arba`ah, বৈরুত, পৃ: ২৪৫।

৭ রিবা আল-নাসিয়াহ হলো সে ধরনের রিবা মহানবী (স.) যাকে বলেছেন : “নাসিয়াহ ছাড়া আর কোনো রিবা নেই” বা অপেক্ষমাণ (বুখারি, কিতাব আল-বুয়ূ্য, বাব বাই আল-দিনার বি আল দিনার নাসায়ান; আরো দেখুন মুসলিম, কিতাব আল-মুসাকাত, বাব বাই আল-তাম মিথলান বি মিথলিন)। ‘রিবা আল ফাদল’-এর বিষয়টিও নবী (স.) একাধিকবার উল্লেখ করেছেন : “সোনার বদলে সোনা, রুপার বদলে রুপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ– এমন একটির বদলে অনুরূপ একটি, সমান-সমান এবং হাতে-হাতে; পণ্য যদি ভিন্নরূপ হয় তাহলে ইচ্ছা করলে তুমি তা বিক্রি করে দিতে পারো, তবে শর্ত হলো হাতে-হাতে এর বিনিময় ঘটবে” (মুসলিম, কিতাব আল-মুসাকাত, বাব আল-সরফ ওয়া বাই আল-ধাহাব বি আল-ওয়ারাক নাকদান; আরো দেখুন তিরমিজি)।

নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন যাতে এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হয়। তারা 'রিবা'কে সংজ্ঞায়িত করেছেন বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত হিসেবে। কোনো পণ্য বিনিময় বা বিক্রিকালে এর মালিক (ঋণদাতা) অন্য পক্ষকে সমমূল্যের কিছু বা ক্ষতিপূরণ না দিয়েই বাড়তি লাভ করে।[৮]

ইসলাম-পূর্ব এবং ইসলামের প্রথম যুগে, ঋণ পরিপক্বতার সময়সীমা সম্প্রসারণের শর্ত হিসেবে অর্থের বৃদ্ধিকে 'রিবা' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সে যুগে আরব অঞ্চলে অর্থ ঋণ দেয়া হতো এবং এই ঋণের জন্য 'অর্থের মূল পরিমাণ' অক্ষত রেখে ঋণদাতা বাড়তি কিছু অর্থ লাভ করত। ঋণ পরিপক্বতার সীমা উত্তীর্ণ হলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে আসল অর্থ দাবি করত। ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে মূল অর্থের অঙ্কটি বেড়ে যেত এবং সময় বাড়িয়ে দেয়া হতো। তখন লেনদেন হতো সুনির্দিষ্ট সময় ও সুদ পরিশোধ এবং নানা রকম ফটকাবাজির ভিত্তিতে। ইসলাম-পূর্ব যুগে সবধরনের বাণিজ্যিক লেনদেনে এগুলো ছিল অপরিহার্য উপাদান।

কোনো ঋণগ্রহীতা যদি মেয়াদ শেষে সুদসহ ওই ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তাকে তা পরিশোধের জন্য সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু একই সময়ে তার ঋণের অঙ্কটি দ্বিগুণ হয়ে যায়। এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।" (৩:১৩০)

৩. 'রিবা' নিষিদ্ধ করেছে আল-কুরআন

আল-কুরআনে পর্যায়ক্রমে 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে চারবার আয়াত নাজিল হয়েছে। প্রথম আয়াত নাজিল হয় মক্কায় এবং তা 'রিবা' নিষিদ্ধ হওয়ার আগে। এর মধ্য দিয়ে 'নিষিদ্ধে'র পথ প্রশস্ত করা হয়। এতে বলা হয়েছে :

"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।" (সূরা আর-রূম, ৩৯)

দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয় মদিনায়। তাতে 'রিবা'র বিষয়টি এসেছে এভাবে :

"বস্তুত ইহুদিদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল– তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধাদানের দরুণ। আর এ

---

৮ হক, জিয়াউল, Islam and Feudalism: The Moral Economics of Usury, Interest and Profit, কুয়ালা লামপুর, ১৯৯৫, পৃ: ১৬, রিবার সংজ্ঞা আরো দেখুন, জোসেফ স্কচ, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ১৯৩৯ সংস্করণ।

কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আজাব।" (সূরা আল-নিসা, ১৬০-৬১)

এই আয়াত মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, এই নিষেধাজ্ঞা কি মদিনার মুসলমানদের ওপর নাকি ইহুদিদের ওপর আরোপ করা হয়েছে। তবেও ইহুদিদের চেয়ে মুসলমানদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা জারির পক্ষে যুক্তি প্রবল। কারণ নবী মুহাম্মদ (স.) যখন মক্কায় অবস্থান করছেন তখনই প্রথম 'রিবা'র প্রতি বিতৃষ্ণা'র মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া, এ আয়াত নাজিলের সময় মদিনায় ইহুদিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অন্য দিকে, মদিনার ইহুদিরা মূলত ছিল কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী নয়।

সূরা আলে-ইমরানেও এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এখানে প্রথম 'রিবা' শব্দের উল্লেখ করে তা নিষিদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয় :

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।" (৩:১৩০)

এই প্রথম মদিনায় নাজিল হওয়া আয়াতে রিবার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেশির ভাগ মুফাসসির একমত যে এখানে 'চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ'-এর যে কথা বলা হয়েছে তা রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করে না। মানুষ রিবা লেনদেনে অভ্যস্ত ছিল। তাই ধরে নেয়া যায় এই 'চক্রবৃদ্ধি'র বিষয়টি লেনদেনের একটি অবস্থার বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয় এবং তা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নয়।[৯]

সূরা আল-বাকারায় রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো রিবা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে মদিনায় নাজিল হওয়া সর্বশেষ আয়াত। এখানে বলা হয়েছে :

"যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে– কেনাবেচাও তো সুদ নেয়ারই মতো! অথচ আল্লাহ তা'আলা কেনাবেচা বৈধ করেছেন এবং সুদ করেছেন হারাম। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোজখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানখয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো

৯ কুতুব, সাইয়্যিদ, ফি জালালিল কুরআন, বৈরুত, ১৯৯৭, পৃ: ৬০।

অবিশ্বাসী পাপীকে পছন্দ করেন না। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামাজ কায়েম করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সব বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার কোরো না এবং কেউ তোমাদের ওপর অত্যাচার করবে না। যদি খাতক অভাবী হয় তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো। ওই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না।" (২: ২৭৫-২৮১)

এই আয়াতগুলোতে রিবার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং সবচেয়ে জোরালো ভাষায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে (২৮০ নম্বর আয়াত) ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার জন্য ঋণদাতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ঋণদাতার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে: ক) রিবার যেসব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করার জন্য, খ) ঋণগ্রহীতা আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত থাকলে থাকলে তাকে ঋণের মূল অঙ্ক পরিশোধের জন্য সময় প্রদান, বা, গ) একটি দাতব্য কর্ম হিসেবে ঋণ পুরোপুরি মাফ করে দেয়া।

তাই রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলোতে দেখা যায় এখানে অন্যের কাছ থেকে অবৈধভাবে আদায় করা সব ধরনের সম্পদের নিন্দা জানানো হয়েছে। এ ধরনের সব কর্মকাণ্ড নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে। তা ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যে-ই করুক না কেন। এর মূলনীতি হলো : কাউকে মুনাফা অর্জন করতে হবে নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে, অন্যকে শোষণ করে নয়। আল-কুরআনে রিবাকে অবিশ্বাসীদের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বিশ্বাসীদের জন্য একটি পরীক্ষা, তারা রিবা পরিত্যাগ করে চলবে।

উল্লিখিত আয়াতগুলো রিবার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেখানে উৎপাদন বা ভোক্তা ঋণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, কুরআন নাজিলের যুগে ঋণ নেয়া হতো কেবল ভোগের উদ্দেশ্যে। অবশ্য এ ব্যাপারে আরো গবেষণা হওয়া দরকার। কারণ, নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর সময়ে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণ নেয়ার অনেক দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০] তাতে দেখা যায়, তখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর রাজনৈতিক

১০ আল-আফগানী, সাঈদ, Aswaq al-`Arab Fi al-Jahiliyyah Wa al-Islam, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৫।

ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে আরব বণিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এসব দেশে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণ নেয়ার রেওয়াজ শত শত বছর ধরে চলে আসছিল। ঐতিহাসিক দলিলগুলোতে আরো দেখা যায়, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক সঙ্ঘাতের কারণে ইসলাম সূচনা-পূর্ব যুগে রোম মক্কার আরব বণিকদের মাধ্যমে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। তাই তখন উৎপাদনের জন্য ঋণের লেনদেন হয়নি এটা ভাবা কঠিন। উপরিলিখিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কিত মুফাসসিরদের যত বর্ণনা আমাদের কাছে এসেছে তা মূলত নবী (স.)-এর কাছাকাছি সময়ের। তাই তখন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের লেনদেনেও যে রিবা যুক্ত ছিল, তা সুস্পষ্ট।[১১]

যাহোক আল-কুরআনে নিরঙ্কুশভাবে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার মানে হলো এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ যেখানে সবরকম শোষণের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে। বিশেষ করে, কোনোরকম ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই অর্থায়নকারীর মুনাফাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং ব্যবস্থাপনা ও কঠোর পরিশ্রম করার পরও উদ্যোক্তার মুনাফাপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তার মতো অবিচার দূর হবে। 'রিবা' নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে আল-কুরআন অর্থায়নকারী ও উদ্যোক্তার মধ্যে সমতা নিশ্চিত করে। তাই রিবাকে একটি বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় বিধিনিষেধ মনে করা এবং একে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নীতি, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে না করা হলে বিভ্রান্তি তৈরি হতে বাধ্য।

৪. সুন্নাহ্য় রিবা নিষিদ্ধের তাগিদ

আল-কুরআনে রিবার কোনো সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। এমনকি এতে রিবার বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যাও নেই। হাদিসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। যদিও কখনো কখনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে একটি হাদিসের বর্ণনার সঙ্গে অন্য হাদিসের বর্ণনায় কিছুটা অমিল দেখা যায়। তাই এ বিষয়ে হাদিসের কিছু বর্ণনা দেয়াই যথেষ্ট হবে। আল-কুরআনে রিবা বলতে বুঝানো হয়েছে 'রিবা আল-নাসিয়াহ্'[১২] বা বিলম্বে পরিশোধিত সুদ। অন্য দিকে, হাদিসে একে বলা হয়েছে 'রিবা আল-ফাদল' বা বর্ধিত সুদ।[১৩]

---

১১ এ ব্যাপারে দেখুন, সাইয়্যিদ কুতুব, তাফসির 'আয়াত আল-রিবা', বৈরুত; দার আল-বুহুথ আল-ইলমিয়াহ্।

১২ 'নাসিয়াহ্' শব্দের অর্থ স্থগিত করা, 'বিলম্ব' বা 'অপেক্ষা'।

১৩ থাকিফ গোত্র যখন মুঘিরা গোত্রের কাছ থেকে ঋণের পাওনা দাবি করে তখনই প্রথম নবী (স.) 'রিবা আল-ফাদল' নিয়ে আলোচনা করেন। ইসলাম-পূর্ব সময়ে এই ঋণের লেনদেন হয়েছিল। নবী (স.) থাকিফ গোত্রকে বলেন, আল-কুরআনে ইসলাম-পূর্ব যুগের সব রিবা পরিত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার তিনি বিদায় হজের ভাষণে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'জাহেলি যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করে দেয়া হলো। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের সুদ–আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করে দিলাম। সব বাতিল হয়ে গেল''। দেখুন, আহমদ আল-বায়হাকী, আল-সুনান আল-কুবরা, হায়দ্রাবাদ, ১৮৫৪, অনুচ্ছেদ ৫, হাদিস ২৭৫।

প্রথমটি হলো ঋণ পরিশোধের জন্য ধারগ্রহণকারীকে বাড়তি সময় দান। এর বিনিময়ে ঋণকারী নির্ধারিত বা পরিবর্তিত হারে মূল অর্থের অতিরিক্ত বা বাড়তি অর্থ প্রদান করেন অথবা ঋণদাতা ঋণের শর্ত হিসেবে বাড়তি কোনো উপহার বা সেবা গ্রহণ করেন। আর দ্বিতীয়টি হলো, বাজারে সহজলভ্য এমন একটি পণ্যের বিনিময়ে বাজারে সহজলভ্য নয় এমন কোনো পণ্য বিক্রি। এমনকি সুদ এড়াতে দুটি পণ্য সমান পরিমাণে বিনিময় করা হলেও। বিনিময়ের ক্ষেত্রে পণ্যগুলো সমপরিমাণ কি না তা এখানে বিবেচ্য নয়। পণ্যগুলোর বৈসাদৃশ্য এখানে বিবেচ্য। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে হাদিসে রিবা আল-নাসিয়াহ্ এবং রিবা আল-ফাদল দুই ধরনের রিবা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রথম ধরনের রিবা হলো সেই ধরনের, যেখানে আল্লাহর নির্দেশনা বলবৎ-এর কথা বলা হচ্ছে এবং তা দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বহুসংখ্যক হাদিসে 'রিবা আল-ফাদল' স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত এবং গ্রহণযোগ্য হাদিস হলো, "সোনার বদলে সোনা, রুপার বদলে রুপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ, এভাবে একটির অনুরূপ আরেকটি, (বিক্রি করো) নগদ-নগদ, (কিন্তু) ধরন যদি বদলে যায়, তাহলে তোমাদের পছন্দমতো বিক্রি করো নগদ-নগদ।"[১৪]

আবু সাঈদ আল-খুদরী নবী (স.) থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন : "তোমরা কমবেশি করে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি কোরো না। হ্যাঁ, সমান সমান বিক্রি করতে পারো। তোমরা কমবেশি করে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি কোরো না। হ্যাঁ, সমান সমান বিক্রি করতে পারো। তোমরা এসব জিনিস বাকির বিনিময়ে নগদে বিক্রি কোরো না।"[১৫]

তাই, সোনা, রুপা, গম, যব বা বার্লি, খেজুর ও লবণ যদি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা হয় তাহলে সেগুলো ঘটনাস্থলেই বিনিময় করতে হবে এবং তা হতে হবে সমপরিমাণ ও সমরূপ। উল্লিখিত ৬টি পণ্যের মধ্যে সোনা ও রুপা নিঃসন্দেহে অর্থের (টাকা) প্রতিনিধিত্ব করে। বাকি ৪টি প্রতিনিধিত্ব করে খাদ্যশস্যের। কেবল এ ৬টি পণ্যের মধ্যে রিবা আল-ফাদল সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি তা সাধারণভাবে সব পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—এ নিয়ে মুসলিম আইনবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। অর্থ-পণ্য হিসেবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বহুল ব্যবহারের কারণে সাধারণভাবে বলা যায় বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন যেকোনো পণ্যই রিবা আল-ফাদল-এর আওতায় আসবে। অন্য চার পণ্যের ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

---

১৪ আহমাদ, বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থ।

১৫ বুখারী, পূর্বে উল্লিখিত, কিতাব আল-বুয়্য, বাব বাঈ আর-ফিদদাহ বি আল-ফিদদাহ; আরো দেখুন, সহিহ মুসলিম, সুনান আল-তিরমিজি, সুনান আল-নাসায়ি এবং মুসনাদে আহমাদ।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রথমত এই মতভেদগুলো ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার; এবং দ্বিতীয়ত আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই মতভেদ সত্ত্বেও বেশির ভাগ মুসলিম আইনবিদ রিবা আল-নাসিয়াহ বা রিবা আল-ফাদল নিষিদ্ধ না হওয়া নিয়ে কোনো কথা বলেননি। ইসলামী শরী'আহ্‌র মূল উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মুসলিম আইনবিদের মধ্যে দ্বিমত নেই। ১৯৬৫ সালে ইসলামিক রিসার্চ অ্যাকাডেমির দ্বিতীয় সম্মেলনে মুসলিম আইনজ্ঞরা এ ব্যাপারে একটি ফতোয়া (আইনি বিধান) জারি করেন। তাতে রিবা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করা হয়।[১৬] পরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ্ অ্যাকাডেমি আগের মুসলিম আইনবিদদের দেয়া রিবা নিষিদ্ধের ব্যাখ্যাগুলো সমর্থন এবং সব সুদি লেনদেনের নিন্দা জানায় ও তা বাতিল বলে ঘোষণা করে।[১৭]

৫. রিবা সম্পর্কে আধুনিক ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি[১৮]

রিবা নিয়ে আধুনিক ও রক্ষণশীল পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের একটি অংশ ইসলামের সেই সূচনালগ্ন থেকে চলে আসছে। আল-কুরআন আসলে কোনো ধরনের রিবা নিষিদ্ধ করেছে সে প্রশ্নকে ঘিরে তাদের মধ্যে চলছে বিতর্ক। এটা কি ঋণ লেনদেন সম্পর্কিত রিবা আল-নাসিয়াহ্ নাকি কেনাবেচা সম্পর্কিত রিবা আল-ফাদল?[১৯] একটি মত হচ্ছে, ইসলামের শুরুর দিকে মনে করা হতো রিবার ওপর কুরআনের নিষেধাজ্ঞা কেবল অর্থ ও খাদ্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে এবং এর বাইরে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা পরবর্তীকালের ঘটনা।[২০] আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো, হাদিস থেকে রিবা আল-ফাদলের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং হাদিসের ভিত্তিতে রিবা সংজ্ঞায়িত করার কোনো উদ্যোগ সত্যিকারভাবে সফল হয়নি।[২১] অতি সম্প্রতি কিছু গবেষণায় দাবি করা হয় যে কেনাবেচা ও ঋণ দেয়া উভয় ক্ষেত্রে রিবা ইসলাম আবির্ভাবের

---

১৬ আহমেদ, ওসমান বাবিকির, The Contribution of Islamic Banking to Economic Development: The Case of The Sudan, পিএইচডি থিসিস; অর্থনীতি বিভাগ, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০, পৃঃ ৩২।

১৭ আল-ওমর, ফুয়াদ ও আবদেল হক মোহাম্মদ, Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges, লন্ডন; জেড বুকস লিঃ, ১৯৯৬, পৃঃ ৮।

১৮ এই নিবন্ধে 'আধুনিক' বলতে সাম্প্রতিক কালের মুসলিম চিন্তাবিদ যেমন ফজলুর রহমান (১৯৬৪), মোহাম্মদ আসাদ (১৯৮৪), সাঈদ আল-নাজ্জার (১৯৮৯), সাঈদ তানতাবি (১৯৯৭) এবং অন্যদের বুঝানো হয়েছে। তারা মনে করেন, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ যতটা না 'সুদের হার' ধারণার জন্য, তারচেয়ে বেশি দরিদ্রকে শোষণের জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে তাদের অনেকে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের রিবার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তারা এগুলোর কিছু অবৈধ এবং কিছু বৈধ বলে দেখানোর চেষ্টা করেন। অন্য দিকে, রক্ষণশীল মত হলো রিবা সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যা। এখানে যেকোনো ধরনের সুদ 'রিবা নিষিদ্ধে'র আওতায় আসবে বলে জোর দেয়া হয়।

১৯ হক, জিয়া-উল, প্রাগুক্ত, Islam and Feudalism: The Moral Economy of Usury, Interest and Profit, পৃঃ ৬৭-১১৪।

২০ স্কচ, জোসেফ, An Introduction to Islamic Law, অক্সফোর্ড, ১৯৬৪, পৃঃ ১৪৭।

২১ রহমান, ফজলুর, Riba and Interest, ইসলামিক স্টাডিজ, নং ১, মার্চ ১৯৬৪, পৃঃ ৩০।

আগেই সমাজে রিবাজমান ছিল এবং আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধিকন্তু হাদিস এবং আইনবিদদের প্রণীত বিধিবিধান আল-কুরআনে বর্ণিত ধারণারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আরো যুক্তি দেখানো হয় যে রিবা আল-ফাদল, রিবা আল-নাসিয়াহ্‌র একটি ফলাফল ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ টাকা যেকোনো সময় পণ্যে রূপান্তরিত করা যায়।[২২]

সমসাময়িক কালের বিতর্ক হচ্ছে রিবার সংজ্ঞা নিয়ে। এটা কি শুধু সুদযুক্ত ঋণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে শক্তিশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষ শোষিত হচ্ছে; নাকি উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন সবরকম ঋণ এর আওতায় আসবে? নাকি ইসলাম-পূর্ব যুগে প্রচলিত ছিল এমন ধরনের রিবা লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে? নাকি ইসলাম ইউজারি নিষিদ্ধ করেছে সুদ নয়; অথবা সার্বিকভাবে সব ধরনের সুদারোপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এই নিষেধাজ্ঞা ভোক্তা ঋণ নাকি বিনিয়োগ বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে ব্যবহৃত ঋণের সঙ্গে যুক্ত; এটা নামেমাত্র নাকি প্রকৃত সুদ নিষিদ্ধ করেছে; এই নিষেধাজ্ঞা সরল সুদের ওপর নাকি চক্রবৃদ্ধি সুদের ওপর প্রযোজ্য; অথবা এই নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তি নাকি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণগ্রহীতার ওপর কার্যকর হবে? রিবার[২৩] ব্যাপারে আধুনিকপন্থীদের বক্তব্য হলো সেসব ক্ষেত্রে ঋণের ওপর অতিরিক্ত চার্য অনুমোদনযোগ্য, ঋণ যখন :

১. সমাজে শক্তিমানদের দ্বারা দুর্বলদের শোষিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে;
২. ইসলাম-পূর্ব যুগে যে ধরনের ঋণ লেনদেন করা হতো, তার অনুরূপ;
৩. বর্তমান সুদি ব্যাংকগুলোতে যেধরনের লেনদেন করা হয়, কিন্তু সুদখোরি লেনদেনের জন্য নয়;
৪. ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জন্য, কিন্তু ভোক্তাঋণের জন্য নয়;
৫. মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঋণদাতা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়;
৬. সরল মুনাফার জন্য, কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে নয়; এবং
৭. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের জন্য।

তবে, রক্ষণশীলরা যেকোনো ধরনের স্থির ও পূর্বনির্ধারিত সুদই নিষিদ্ধ বলে মনে করেন।[২৪] তাদের বক্তব্য, আল-কুরআনে ধারের উপর বাড়তি যেকোনো অর্থ আরোপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই মত অনুসারে, সহনীয় বা অসহনীয় যা-ই হোক না কেন সুদ যেহেতু ধারের

---

২২ হক, জিয়া-উল, প্রাগুক্ত, Islam and Feudalism: The Moral Economy of Usury, Interest and Profit, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

২৩ রহমান, ফজলুর, শিকাগো, Transformation of an Intellectual Tradition, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৮২, পৃঃ ৩০-৩৩।

২৪ রক্ষণশীল মতবাদ সমর্থন করেন এমন অনেকের মধ্যে রয়েছে কুরেশি, Islam and the Theory of Interest, লাহোর, ১৯৯১, পৃঃ ১০০; মান্নান, Islamic Economics: Theory and Practice, দিল্লি, ১৯৮০, পৃঃ ২১৮।

অঙ্কের অতিরিক্ত, এটা একধরনের রিবা এবং তা কুরআনের নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই অর্থ ব্যবহারের জন্য যেকোনো পূর্বনির্ধারিত স্থির মুনাফাকে 'রিবা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ইসলামে রিবার কঠোর নিন্দা জানানোর পেছনে প্রধান তিনটি কারণ :[২৫]

১. রিবা গুটিকতক মানুষের হাতে সম্পদ সঞ্চিত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে। এতে অপরাপর মানুষের প্রতি তাদের মানবিক মনোভাব মুছে যায়।

২. ইসলাম এমন কোনো আর্থিক কর্মকাণ্ড অনুমোদন করে না যেখানে উপকারভোগী সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি বহনের অংশীদার হয় না; নামমাত্র সুদের আইনি নিশ্চয়তাটিও নিশ্চিত লাভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৩. ইসলাম কঠোর পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত তৎপরতার মাধ্যমে সম্পদ আহরণের বিপরীতে সুদ বা ইউজারির মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয়কে স্বার্থপরতা বলে মনে করে।

রিবা সম্পর্কে বেশ কয়েকজন আধুনিক ও রক্ষণশীল পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের যুক্তি নিচে আলোচনা করা হলো :

৫.১. জুলুম ও শোষণ প্রতিরোধের জন্য রিবা নিষিদ্ধ

আধুনিকপন্থীরা রিবা নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়ার পক্ষে। তারা যুক্তি দেখান, আল-কুরআন এই নিষেধাজ্ঞাকে যৌক্তিক করেছে জুলুম ও পরিশ্রমের বিষয়গুলো তুলে ধরে।[২৬] তারা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে ইসলামের প্রথম যুগের কিছু মনীষী যেমন- ইমাম রাজায়ী[২৭] এবং ইবনে কাঈয়িমের[২৮] লেখনী তুলে ধরেন। সেখানে দেখা যায়, সুদের জন্য সুদ নিষিদ্ধ করা হয়নি, এটি নিষিদ্ধ হয়েছে অভাবগ্রস্তকে শোষণ করার জন্য। এই মতের অনুসারী অনেক লেখক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চালু বিভিন্ন ধরনের সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে চান। তারা এগুলোর কিছু বৈধ এবং কিছু অবৈধ বলে মত দেন।[২৯]

এই মতের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তি হতে পারে যে, আল-কুরআনে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হলো এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যেখানে কোনো ধরনের জুলুম ও শোষণ থাকবে না। বিশেষ করে এখানে জুলম হলো, অর্থায়নকারীকে একটি ইতিবাচক মুনাফার

---

২৫ কারস্টেন, ইনগো, Islam and Financial Intermediation, ওয়াশিংটন ডিসি, আইএমএফ স্টাফ পেপারস, ১৯৮২, পৃ: ১১১।

২৬ আল-কুরআন, ২:২৭৯।

২৭ আল-রাজায়ী, ফখর আল-দ্বীন, আল-তাফসির আল-কাবির, খণ্ড ৭, তেহরান, পৃ: ৯৪।

২৮ ইবনে আল-কাইয়্যিম, মুহাম্মদ, আন রাব্বিল আলামিন-এ 'আলম আল-মুয়াক্কিন', খণ্ড ২, কায়রো, ১৯৫৫, পৃ: ১৫৭।

২৯ সালেহ, নাবিল এ., Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking, ক্যামব্রিজ, ১৯৯২, পৃ: ৩৪।

নিশ্চয়তা দেয়া যেখানে তিনি কোনো শ্রম দেন না বা কোনো ঝুঁকি বহন করেন না।[৩০] অন্য দিকে, ব্যবস্থাপনা পরিচালন ও কঠোর শ্রম দেওয়ার পরও উদ্যোক্তা কোনো ইতিবাচক মুনাফার নিশ্চয়তা পান না। তাই রিবা নিষিদ্ধ করার মানে হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার একটি উপায়।[৩১]

৫.২. ইসলাম-পূর্ব যুগের রিবা নিষিদ্ধ

আধুনিকপন্থী কিছু পণ্ডিত দাবি করেন, আল-কুরআন ওই ধরনের রিবা নিষিদ্ধ করেছে যা ইসলাম-পূর্ব যুগে ধার দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হতো। ইসলাম-পূর্ব যুগ এবং আরব ভূখণ্ডে রিবা ধার্যের ক্ষেত্রে কিছু অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নেয়া ঋণের অর্থের ওপর ঋণদাতাকে একটি নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে হতো। ঋণ বকেয়া পড়ে গেলে এই অতিরিক্ত অর্থ দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে পড়ত। এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছে আল-কুরআন। আধুনিকপন্থীরা মনে করেন, মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে প্রথমবার বৃদ্ধি বৈধ। কিন্তু মেয়াদ শেষে বা ঋণ পরিপক্ব হওয়ার পর যদি পরিপক্বতার সময় স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এর বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয়, তবে তা হবে নিষিদ্ধ। এই মতবাদ এসেছে, ইসলাম-পূর্ব যুগে রিবার অনুশীলন কেমন ছিল সে বিষয়ে ইবনে জারির আল-তাবারির তাফসিরে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে।[৩২] তবে, কোনো অপরিহার্য শর্ত ছাড়াই রিবা গ্রহণযোগ্য, এমন কোনো বক্তব্য এখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় না।

এই মতবাদের সমালোচকেরা জোর দিয়ে বলেন, কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১৩০ নং আয়াত নাজিলের সময় ছিল রিবা নিষিদ্ধের প্রথমপর্যায়। এই আয়াতে 'আদাফান মুদা আফাতান' (দ্বিগুণ এবং পুনঃ দ্বিগুণ, অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি) পরিভাষা উল্লেখ করা হয়েছে কেবল আরবদের চর্চা বুঝানোর জন্য। আরোপিত অর্থ দ্বিগুণ না হলে রিবা বৈধ হবে সে কথা এখানে বলা হয়নি।

---

৩০ মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি যদি আমরা দেখি : ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে সবধরনের মূল্য পরিমাপে ন্যায্যতার ওপর জোর দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি অর্থের প্রকৃত মূল্য অব্যাহতভাবে ক্ষয় করে চলে। তাই ইসলাম ভারসাম্য ও সুস্থিতির বিষয়ে যে গুরুত্ব দিয়েছে এটা তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে বলা হয় যে বর্তমান বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশে সব আয় ও আর্থিক সম্পদের ইনডেক্সেশন বা অর্থমূল্য সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামের আর্থসামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব পরিতুষ্ট করা যাবে। ১৯৭৮ সালের অক্টোবরে জেদ্দায় কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত একটি সেমিনারে ড. সুলতান আবু আলী এই অভিমত ব্যক্ত করেন। এরপর তার এই অভিমত নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটিতে তুমুল আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, মোহাম্মদ আরিফ (সম্পাদিত), Monetary and Fiscal Economics of Islam, জেদ্দা, ১৯৮২, পৃ: ১৪৫-১৮৬। আরো দেখুন, রফিক ওয়াই আল-মাসরি, আল জামি ফি উসুল আল-রিবা, দামেস্ক, ১৯৯১, পৃ: ২৩৭-২৩৯।

৩১ আল-ওমর, ফুয়াদ এবং আবদেল-হক মোহাম্মদ, Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯।

৩২ আল-তাবারি, মোহাম্মদ ইবনে জারির, জামি আল-বয়ান ফি তাফসির আল-কুরআন, খণ্ড-৬, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ: ২৭।

অধিকন্তু তারা মনে করেন, সর্বশেষ নাজিল হওয়া আয়াতগুলোতে (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫-২৭৮) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মূলের ওপর যেকোনো বৃদ্ধি রিবা হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তা অবৈধ। এই মতবাদের অনুসারীরা বলেন, পরে নাজিল হওয়া আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের আয়াতগুলোর নির্দেশনা বাতিল হয়ে গেছে। পরবর্তী আয়াতের নির্দেশই সব ধরনের রিবা– অর্থাৎ সরল, যৌগিক, স্থির বা পরিবর্তনশীল রিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।[৩৩] এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক বলে আল-তাবারিসহ অন্যান্য মুফাসসির রায় দিয়েছেন এবং তারা এর পক্ষে একটি সহিহ হাদিস তুলে ধরেন। ওই হাদিসে নবী (স.) বলেছেন : "আল্লাহ আদেশ করেছেন যেকোনো রিবা থাকবে না; জাহেলিয়াতের (ইসলাম-পূর্ব যুগ) প্রতিটি রিবা আমার দুই পায়ের নিচে এবং আমি আমার চাচা আব্বাসের পাওনা সুদ বাতিল করে নবযাত্রার সূচনা করলাম"।[৩৪]

৫.৩. সুদ বনাম ইউজারি

রিবার ওপর কুরআনের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আরেকটি বিতর্ক রয়েছে, তা হলো এটা 'সুদ', নাকি 'ইউজারি'।[৩৫] আধুনিকপন্থীদের বক্তব্য হলো, রিবা তখনই 'সুদ' হবে যখন তা মূল-এর সমান বা বেশি; তবে তা 'ইউজারি' নয়।

এই ঐশ্বরিক নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা চলে আসছে সেই ইসলামের প্রথম শতকে 'ওমর ইবনুল খাত্তাবে'র সময় থেকে। তিনি বলেছেন : "সর্বশেষ নাজিল হওয়া আয়াত ইউজারি সম্পর্কিত এবং এই ইউজারি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করার আগেই নবী (স.)-এর ওফাত হয়। তাই, ইউজারি এবং এর অনুরূপ সব কিছু পরিত্যাগ করো।"[৩৬] লক্ষণীয় বিষয় হলো এখানে রিবা শব্দের অনুবাদ 'সুদ'-এর পরিবর্তে 'ইউজারি' করা হয়েছে। যদিও ওমর (রা.) রিবা বলতে ইউজারি না সুদ বুঝিয়েছেন তা এখানে পরিষ্কার নয়। তবে আধুনিককালে মুহাম্মদ আসাদের[৩৭] মতো আল-কুরআনের কিছু ইংরেজিভাষী তফসিরকারক রিবার অনুবাদ হিসেবে ইউজারি শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই ব্যাখ্যা ওই যুক্তির কাছাকাছি যেখানে বলা হয়,

---

৩৩ সাঈদ, আবদুল্লাহ, Islamic Banking and the Interest : A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, লেইডেন, ১৯৯৬, পৃ: ৪৩।

৩৪ ইবনে কাসির, 'ইসমাইল, তাফসিরুল কুরআন আল-আযিম, ১৯৮২, খণ্ড ১, পৃ: ৩২৭-৩৩১, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের রেফারেন্সসহ; আল-তাবারি, ইবনে জারির, জামি আল-বয়ান, খণ্ড ৬, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭; আল-জাসাস, আহমাদ, আহকাম আল-কুরআন, খণ্ড ১, পৃ: ৫৫৮।

৩৫ দেখুন, এ. এস. হর্নবে, অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লারনার্স ডিকশনারি, নিউ ইয়র্ক, ২০০০, পৃ: ১৪৩৩। এতে 'ইউজারি'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'অন্যায্য উঁচু হারে সুদের বিনিময়ে মানুষকে অর্থ ধার দেয়ার কারবার'। তাই, বিশেষ করে সরকার নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারই হলো সুদের ইউজারি হার।

৩৬ আহমাদ, আল-ইমাম, আল-মুসনাদ, 'বাব আল-রিবা', খণ্ড ২, পৃ: ২৩৯; ইবনে মাজাহ্, আল-সুনান, কিতাব আল-তিজারাহ, খণ্ড ২, পৃ: ৭৬৪।

৩৭ আসাদ, মুহাম্মদ, The Message of The Qur'an, জিব্রালটার, ১৯৮৪, পৃ: ৬১-৬২।

একজন আধুনিক পুঁজিবাদী বহুমাত্রিক ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসায়িক ঋণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হারে সুদ আরোপের পক্ষে থাকেন। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলির অসাধারণ তাফসিরে রিবাকে ইউজারি হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। তিনি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলিত সুদের বিষয়টি সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন : "আমি যে সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেছি তা হলো : সোনা ও রুপা এবং খাদ্যের মতো প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, গম, যব, খেজুর ও লবণ (আল কুরআনে আল্লাহ যেভাবে বর্ণনা করেছেন) থেকে অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে অন্যায্য মুনাফা অর্জন। আমার সংজ্ঞায় অর্থনৈতিক ঋণ ছাড়া সব ধরনের মুনাফাখোরী অন্তর্ভুক্ত। এই মুনাফাখোরী থেকেই আধুনিক ব্যাংকিং ও অর্থায়ন ব্যবস্থার সৃষ্টি।"[৩৮]

অবশ্য রিবা সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা অনেক আধুনিক লেখক প্রত্যাখ্যান করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন মওদূদী।[৩৯] এসব লেখক রিবা বলতে ইউজারির পরিবর্তে সাধারণভাবে সুদকেই বুঝিয়েছেন।[৪০] তারা যুক্তি দেখান যে ইহুদি ধর্ম বা ক্রিশ্চিয়ানিটি–কোনো ধর্মেই 'সুদ' ও 'ইউজারি'র মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। ইউরোপে রেনেসাঁ সৃষ্টির আগ পর্যন্ত এটা ছিল।[৪১] ইসলামেও রিবাকে সুদ না বলে ইউজারি বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এর ওপর যে নিষেধাজ্ঞা তার প্রকৃতি অত্যন্ত কঠোর, নিরঙ্কুশ এবং দ্ব্যর্থহীন।[৪২] অধিকন্তু তারা তাদের অভিমতের সমর্থনে বহুসংখ্যক হাদিস হাজির করেন। দেখা যায়, নবী (স.) ঋণ প্রদানের শর্ত হিসেবে মূলের অতিরিক্ত সামান্য কোনো উপহার, সেবা বা আনুকূল্য গ্রহণ করতেও নিষেধ করেছেন।[৪৩]

রিবা সম্পর্কে হজরত ওমর (রা.)-এর ব্যাখ্যা সমর্থন করে তারা বলেন, রিবা নিষিদ্ধ হওয়াকে কোনোভাবেই খাটো করা যাবে না। কারণ ওমর (রা.) বলেছেন, "ইউজারি এবং এর অনুরূপ সবকিছু পরিত্যাগ করো"। তা ছাড়া, নবী (স.) বলেছেন, "যা সন্দেহজনক তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহ নেই তা গ্রহণ করো।"[৪৪] তারা আরো বলেন, বিশেষ করে রিবার গুরুতর

৩৮ আলি, এ. ইউসুফ, The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, লাহোর, ১৯৭৫, পৃ: ১১১ ও ৩২৪।

৩৯ মওদূদী, আবুল আলা, Towards Understanding the Qur'an, লিচেস্টার, ১৯৮৮, পৃ: ২১৩-২৮৬।

৪০ উদাহরণস্বরূপ দেখুন, শাইখ এম. আহমাদ, Economics of Islam: A Comparative Study, দ্বিতীয় সংস্করণ, লাহোর, ১৯৫৮; আনোয়ার ইকবাল কোরেশি, Islam and the Theory of Interest, প্রাগুক্ত, এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, লিচেস্টার, ১৯৯৭; এবং এস. এ. সিদ্দিকী, Public Finance in Islam, লাহোর, ১৯৬২।

৪১ আল-মাসরি, রফিক ইউনিস, মাশরাফ আল-তানমিয়াহ আল-ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮১।

৪২ আল-জারিরি, আবদ আল-রাহমান, Kitab al-Fiqh `ala al-Madhahib al-'Arba`ah, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৫।

৪৩ প্রমাণস্বরূপ দেখুন, বায়হাকীতে উল্লিখিত হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত হাদিস : নবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ঋণ দাও, আর তখন ঋণগ্রহণকারী যদি তাকে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তবে তা গ্রহণ করা উচিত হবে না; এবং ঋণগ্রহণকারী যদি কোনো পশুতে সওয়ারি হওয়ার প্রস্তাব দেয় সে তাতে সওয়ারি হবে না, যদি তারা ইতোপূর্বে এ ধরনের আনকূল্য বিনিময়ে অভ্যস্ত না হয়।"

৪৪ বুখারী, সহিহ আল-বুখারী, কিতাব আল-বুয়্য, খণ্ড ৩, পৃ: ৪; আল-দারিমি, আল-সুনান, কিতাব আল-বুয়্য, পৃ: ৩৩৭।

প্রকৃতির কারণে এ ধরনের পরিস্থিতিতে সতর্কতার মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। নবী (স.) অত্যন্ত কঠোরভাষায় রিবার নিন্দা জানিয়েছেন।[৪৫] তারা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলির সংজ্ঞা এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, অন্যায্য বেড়ে গেলে একধরনের রিবা তৈরি হবে এমন কথা আল-কুরআনে বলা হয়নি। আল-কুরআন বা আল-হাদিস কোথাও রিবাকে কখনো 'অন্যায্য মুনাফা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। তাদের অভিমত হলো, ধারদাতা ধারগ্রহণকারীর কাছ থেকে ধারের অতিরিক্ত যেকোনো বস্তুগত সুবিধা গ্রহণ করলে তা রিবার অন্তর্ভুক্ত হবে। ব্যাংক কৃপা করে টাকা ধার দেয় না, মুদ্রাস্ফীতির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নিতেও সুদ আরোপ করে। তারা এটা করে মুনাফা অর্জনের জন্য। তাই তাদের দাবি অনুযায়ী "আধুনিক ব্যাংকিং ও অর্থায়নের জন্মদাত্রী অর্থনৈতিক ঋণ" নিশ্চিতভাবে রিবা। এর সুদের হার কম না বেশি, সরল না যৌগ তা বিবেচ্য নয়। ফলে 'সুদ' ও 'ইউজারি'র মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টির চেষ্টাকে আধুনিকপন্থীদের শরী'আহ্ সম্পর্কিত অস্বাভাবিক ধারণা বলে এসব লেখক মনে করেন।

৫.৩. ভোক্তা ঋণ বনাম বিনিয়োগ ঋণ

কতিপয় আধুনিকপন্থী লেখক 'ভোক্তা ঋণ' ও 'বিনিয়োগ ঋণ'কে আলাদা করে দেখতে চান। তাদের মতে, ভোক্তা ঋণের ওপর রিবা অবৈধ, কিন্তু বিনিয়োগ বা উৎপাদন ঋণের ওপর তা বৈধ।[৪৬] তারা দাবি করেন, রিবার ওপর কুরআন যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তার ভিত্তি হলো, যে ধার গ্রহণ করছে তার ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তা নেয়া হচ্ছে কিনা। অতএব আল-কুরআন সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগণকে শোষণ থেকে রক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত ভোগ নিরুৎসাহিত করতে চায়। অন্য দিকে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে, রিবা নিষিদ্ধ করার মৌলিক কারণ হলো এটা ঋণদাতাকে কোনো শ্রম ছাড়াই আয় লাভের সুযোগ করে দেয়।[৪৭] এই অভিমতের সমর্থনে তারা কিছু ঐতিহাসিক দলিল তুলে ধরেন। তারা বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে ব্যবসা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণের প্রচলন ছিল না। অন্য দিকে, ভাগাভাগি এবং অংশীদারিত্ব ছিল পুঁজি বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। অধিকন্তু যুক্তি দেখানো হয়, সপ্তম শতকের আরবে ঋণ নেয়া হতো মূলত ভোগ বা আপদকালীন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য। উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নয়। তাই ব্যবসায়িক ঋণের ওপর 'রিবা' ধার্য করা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

অন্য দিকে রক্ষণশীল লেখকেরা এই বিতর্ক খণ্ডন করতে আরো এক ধাপ অগ্রসর হন। তারা বলেন, রিবা-সংক্রান্ত নির্দেশ নাজিল হওয়ার সময় রিবাভিত্তিক কিছু ধরনের লেনদেনের

৪৫ মুসলেহ-উদ্দিন, মুহাম্মদ, Mohammad, Insurance and Islamic Law, নয়া দিল্লি, ১৯৮২, পৃ: ৯৬।

৪৬ দেখুন, মুহাম্মদ আবু জাহরা, Buhuth Fi al-Riba, কুয়েত; দার আল-বুহুত আল-ইলমিয়াহ্, ১৯৭০, পৃ: ৫২।

৪৭ নুরজয়, এম. সিদ্দিক, Islamic Laws on Riba (Interest) and their Economic Implications, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব মিডল ইস্ট স্টাডিজ, খণ্ড ১৪, ১৯৮২, পৃ: ৪।

প্রচলন না থাকলেও সেগুলোও এই আইনের আওতায় আসবে। এ বক্তব্যের সমর্থনে তারা যুক্তি দেন যে যখন মাদকজাতীয় পানীয়ের ব্যাপারে কুরআনের হুকুম নাজিল হয়েছিল তখন আজকের মতো অনেক পানীয়ই ছিল না। এরপরও সবাই এসব পানীয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একমত। অধিকন্তু এই মতবাদের প্রবক্তারা আধুনিকপন্থীদের বক্তব্য খণ্ডন করে ঐতিহাসিক প্রমাণ হাজির করে দেখান যে ইসলামের প্রথম যুগেও বাণিজ্যিক ঋণ দানের প্রচলন ছিল।[৪৮] এই বক্তব্য সমর্থন করে মিসরের পণ্ডিত শেখ আবু জারাহ বলেন :

"জাহেলিয়াতের (ইসলাম-পূর্ব) যুগে কেবল ভোক্তাঋণের প্রচলন ছিল এই বিতর্কের সমর্থনে নিরঙ্কুশ কোনো প্রমাণ নেই। বরং সে সময় উৎপাদন ঋণ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় এক গবেষকের গবেষণায়। আরবের পরিস্থিতি, মক্কার অবস্থান এবং কোরাইশদের বাণিজ্য সবকিছুই দৃঢ়ভাবে এ কথা সমর্থন করে যে তখন উৎপাদনের জন্য ঋণ দেয়া হতো, শুধু ভোগের জন্য নয়।"[৪৯] এই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা আরো দাবি করেন যে রিবার ওপর আল-কুরআনের হুকুম জারির সময় নবী (স.) নিজেও ভোক্তা ও উৎপাদন ঋণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তাই এই অভিমত অনুযায়ী রিবার ওপর নিষেধাজ্ঞা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করতে হবে এবং ঋণ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে নাকি ভোগের কাজে লাগছে তা নিয়ে বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক।[৫০]

৫.৪. নমিনাল (Nominal) বনাম রিয়েল (Real) ইন্টারেস্ট রেট

রিবা নিয়ে আধুনিক ও রক্ষণশীলদের মধ্যে আরেকটি বিতর্ক দেখা যায় এর মুদ্রাস্ফীতি (inflationary) ও মুদ্রাসঙ্কোচন (deflationary) পরিস্থিতিকে ঘিরে। আধুনিকপন্থীরা বলেন নবী (স.) যদিও মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন,[৫১] কিন্তু ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসঙ্কোচনের প্রভাবসংক্রান্ত কোনো হাদিস নেই। মুদ্রাস্ফীতি অর্থের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, অন্য দিকে মুদ্রাসঙ্কোচন তা বাড়ায়। তাই আধুনিকপন্থীদের অভিমত হলো, মুদ্রাস্ফীতিমূলক অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঋণদাতা যে ক্ষতির শিকার হন তা সংশোধনের জন্য অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুদের একটি হার যৌক্তিক হতে পারে। এই অভিমতের সমর্থনে তারা ঋণ ইনডেক্সেশন (indexation-মূল্য সমন্বয়)-এর কথা বলেন। অর্থাৎ ঋণদাতাকে কোনো পূর্বনির্ধারিত সুবিধা না দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির সমহারে 'সুদ' গ্রহণের

---

৪৮ হাবিবি, নাদের, The Economic Consequences of the Interest-Free Islamic Banking Systems, পিএইচডি থিসিস: মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৭, পৃ: ১৪-১৫।

৪৯ দেখুন, এম. আবু জারাহ, Buhuth Fi al-Riba, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩-৫৪।

৫০ হক, এম. আযিযুল, আতাউল হক (সম্পাদিত), Readings in Islamic Banking-এর নিবন্ধ, Prohibition of Interest and Some Common Misgivings, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ: ৪২-৪৩।

৫১ আলি, এস.এ., Economic Foundations of Islam, লাহোর, ১৯৬৪, পৃ: ২২-২৩।

অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে ঋণদাতা কেবল তার আর্থিক সম্পদের প্রকৃত মূল্য অক্ষুণ্ন অবস্থায় পাবেন। মুদ্রাস্ফীতি ঋণদাতার আর্থিক সম্পদ ক্ষয় করে ফেলে। অথচ এখানে তার কোনো দোষ নেই।[৫২] ইসলাম ঋণকারীর প্রতি ন্যায়পরায়ণতার আহ্বান জানালেও তা ঋণদাতার প্রতি অবিচারের অনুমতি দেয় না। মুদ্রাস্ফীতি নিঃসন্দেহে রিবাবিহীন ঋণদাতার প্রতি অবিচার করে। কারণ এতে তার হিতৈষী ঋণের প্রকৃত মূল্য ক্ষয় হয়ে যায়।[৫৩] নমিনাল ইন্টারেস্ট দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষিদ্ধ করা হলে তা অর্থ ঋণদানের ওপর একটি অন্তরায়মূলক প্রভাব ফেলবে। এর ফলে অর্থনীতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাই, মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাসের প্রভাব প্রতিরোধ করতে যুতসই সুদ আরোপ এবং ছাড় দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

রক্ষণশীলরা বেশ কিছু যুক্তি তুলে ধরে এই অভিমত বাতিল করে দেন। তারা বলেন, নমিনাল বা রিয়েল রেট অব ইন্টারেস্ট নির্বিশেষে ঋণ লেনদেনের ওপর যেকোনো বৃদ্ধি হবে রিবার ব্যাপারে আল-কুরআন ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার পরিপন্থী। তারা বলেন, সুদ আরোপ করে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের মানে হলো একটি বড় 'মন্দ কাজ' দিয়ে একটি ছোট 'মন্দ কাজ' মোকাবেলা করা। আর ইসলাম কখনো প্রচলিত একটি 'মন্দ কাজ' প্রতিরোধের জন্য নতুন আরেকটি 'মন্দ কাজ' চালু অনুমোদন করে না।[৫৪] এ পর্যন্ত সব মুসলিম আইনবিদের সাধারণ অভিমত 'ঋণ ইনডেক্সেশন'-এর বিরুদ্ধে। কারণ এখানে আর্থিকভাবে হলেও ঋণের একটি ইতিবাচক মুনাফার নিশ্চয়তা থাকে।[৫৫] তাই নমিনাল বা রিয়েল রেট অব ইন্টারেস্ট-এর প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। যেকোনো বৃদ্ধি বা সুদ 'রিবা' বিধায় তা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। অধিকন্তু ইসলামে আর্থসামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো মূল্যের স্থিতিশীলতা, ঋণ ও সম্পদের ইনডেক্সেশন নয়।

৫.৫. চক্রবৃদ্ধি বনাম সরল সুদ

রিবা সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা বলেন যে এর নিষেধাজ্ঞা চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সরল সুদের ক্ষেত্রে নয়। এ বক্তব্যের সমর্থনে তারা আল-কুরআনের ওই আয়াত তুলে ধরেন যেখানে বিশ্বাসীদের প্রতি দ্বিগুণ এবং চতুর্গুণ ইউজারি গলাধঃকরণ না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য বিতর্ক ছাড়াও বিরোধীরা আধুনিকপন্থীদের হাজির করা আয়াতের পর নাজিল হওয়া আরেকটি আয়াত তুলে ধরেন। সেখানে বলা হয়েছে "এবং তুমি যদি অনুতপ্ত

৫২ হক, এম. আযিযুল, আতাউল হক (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, Prohibition of Interest and Some Common Misgivings, পৃ: ৪৫-৪৬।

৫৩ চাপড়া, এম. উমর, Towards a Just Monetary System, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০।

৫৪ হক, এম. আযিযুল, আতাউল হক (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, Prohibition of Interest and Some Common Misgivings, পৃ: ৪৬।

৫৫ চাপড়া, এম. উমর, Towards a Just Monetary System, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০।

হও, তাহলে তুমি তোমার আসল ফেরত পাবে (সুদ ছাড়া)।"[৫৬] এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে ঋণদাতার জন্য মূলের অতিরিক্ত কিছু অনুমোদিত নয়। মহানবী (স.)-এর বিদায় হজের ভাষণেও এ বক্তব্য আরো জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়েছে : "সব রিবা রহিত করা হলো, তবে তোমরা তোমাদের আসল ফেরত পাবে, জুলুম করো না এবং তুমিও জুলুমের শিকার হবে না"।[৫৭] তারা তর্ক করে বলেন, ভাষণের কিছু শব্দ "জুলুম করো না এবং তুমিও জুলুমের শিকার হবে না"–প্রথমে আল-কুরআনে এসেছে (২:২৭৯) এবং নবী (স.) এর পুনরাবৃত্তি করে জানিয়ে দেন যে ঋণগ্রহণকারী যেমন আসলের অতিরিক্ত প্রদানে বাধ্য হওয়ার মাধমে জুলুমের শিকার হবে না, তেমনি ঋণদাতা তার মূল ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে ক্ষতির শিকার হবে না।[৫৮] অতএব এখানে সুদ সরল না চক্রবৃদ্ধি সে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।

৫.৬. ব্যক্তি বনাম প্রতিষ্ঠান

কিছু আধুনিকপন্থী যুক্তি দেন যে নবী (স.)-এর সময়ে আজকের মতো বিশালায়তন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন– ব্যাংক ও অন্যান্য অবকাঠামোর অস্তিত্ব ছিল না। তাই ব্যাংকের সুদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুদ রিবা নিষিদ্ধের আওতায় আসবে না। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হবে। তারা আরো মনে করেন, কোনো ব্যক্তি যদি ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে সুদ গ্রহণ করে তাহলে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। কারণ কোনো ব্যক্তির পক্ষে ব্যাংকের মতো বিশাল কোনো প্রতিষ্ঠানকে শোষণ করা সম্ভব নয়।[৫৯]

এই অভিমতের বিরোধিতা করে যুক্তি দেখানো হয়, আমরা যদি কোনো আধুনিক ব্যাংককে একজন ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করি তবে দেখব এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থ ঋণ নেয় তা ধার দেয়ার জন্য। অর্থাৎ ব্যাংকটি ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মতো আচরণ করছে এবং অর্থ ঋণ দেয়া-নেয়ার প্রক্রিয়ায় এটি সুদ নিচ্ছে এবং দিচ্ছে। আল-কুরআন রিবার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তার প্রকৃতি সার্বজনীন। এ ব্যাপারে কুরআন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। তাই রিবা আদান-প্রদানের ওপর কুরআনের নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেয়া ছাড়াই সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তা ছাড়া বর্তমানে আমরা যে ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দেখি কুরআন নাজিলের সময় তেমনটি ছিল না। কোনো কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়তো তাদের ব্যবসার একটি অংশ হিসেবে রিবা লেনদেন করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রিবার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

---

৫৬ আল-কুরআন, ২:২৭৯।

৫৭ ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক, আল-সিরাহ আল-নাবাবিয়াহ, খণ্ড ২, বৈরুত, ১৯৯৬, পৃ: ৬০৩।

৫৮ আল-তাবারি, মুহাম্মদ ইবনে জারির, জামি আল-বায়ান ফি তাফসির আল-কুরআন, প্রাগুক্ত, ১৯৮০, পৃ: ২৮।

৫৯ খান, আব্দুল জাব্বার, Divine Banking System", Journal of Islamic Banking and Finance, উইন্টার ১৯৮৪, পৃ: ৩০-৩২।

অভিমতের এই পার্থক্য সত্ত্বেও আধুনিকপন্থীরা রিবা নিয়ে সমসাময়িক বিতর্ককে তেমন প্রভাবিত করতে পারেননি। রিবা নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে তাদের বক্তব্যের কিছুটা জবাব দিয়েছেন সাইয়্যেদ কুতুব[৬০] ও মওদূদী'র[৬১] মতো কিছু নব্য-পুনর্জাগরণবাদী সমালোচক। তারা অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রেক্ষাপটে আধুনিকপন্থীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করেন। তা ছাড়া, আধুনিকপন্থীরা আল-কুরআনে রিবা নিষিদ্ধের যৌক্তিতার ভিত্তিতে কোনো সুদৃঢ় তত্ত্বও উপস্থাপন করতে পারেননি। অধিকন্তু বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্থান ঘটেছে রিবা নিয়ে নব্য-পুনর্জাগরণবাদী পণ্ডিতদের চিন্তাধারার ভিত্তিতে। তারা যেকোনো সুদকেই রিবা হিসেবে গণ্য করেন। তাই সুদ নিষিদ্ধ।

৬. ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন নীতিমালা

ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে তার অনুসারীদের রিবাসংশ্লিষ্ট সব লেনদেন পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছে। এর পরও মুসলমানদের অন্য সবার মতো বিভিন্ন কাজে যেমন : নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগে অর্থায়ন, একটি বাড়ি কেনা, একটি গাড়ি কেনা, পুঁজি বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য, বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য এবং সঞ্চয়ের একটি নিরাপদ স্থান পাওয়ার জন্য ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুসলমানরা বৈধ মুনাফা অর্জনের বিরোধী নয়। ইসলাম জনগণকে তাদের অর্থ অলস ফেলে না রেখে শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে বৈধ এমন উদ্যোগে ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে। এ কথা মনে রেখে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো রিবা বা সুদ নিষিদ্ধ। রিবা শুধু ইউজারির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সব ধরনের সুদ এর আওতায় আসবে– বর্তমান যুগের মুসলিম অর্থনীতিবিদেরা এ বিষয়ে মোটামুটি একমত। আল-কুরআন ও নবীজির সুন্নাহ্‌ থেকে আমরা ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন সম্পর্কিত যে নীতিমালা পাই তা খুবই সাধারণ এবং সেগুলো সঙ্কলিত করা যায় এভাবে :[৬২]

৬.১. মূল অর্থের অতিরিক্ত যেকোনো পূর্বনির্ধারিত পরিশোধ নিষিদ্ধ

ইসলাম কেবল একধরনের ঋণ অনুমোদন করে। আর তা হলো কর্জে হাসানা (শাব্দিক অর্থে যাকে হিতৈষী ঋণ বলা যায়)। এখানে ঋণদাতা মূলের ওপর কোনো সুদ বা অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করে না। চিরাচরিত মুসলিম পণ্ডিতরা উপরিউক্ত নীতি এতটাই কঠোরভাবে অনুসরণ করেন যে তাদের একজনের অভিমত হলো, "ঋণ দেয়ার জন্য ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ঋণদাতার কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভের ওপর নিষেধাজ্ঞা এমনভাবে বলবৎ হবে যে ঋণগ্রহীতার খচ্চরের ওপর সওয়ার হওয়া, তার টেবিলে বসে খাওয়া, এমনকি তার দেয়ালের ছায়ায় পর্যন্ত আশ্রয়

---

৬০ দেখুন, সাইয়্যেদ কুতুব, তাফসির আয়াত আল-রিবা, প্রাগুক্ত, আরো দেখুন, ফি জালালিল কুরআন, প্রাগুক্ত।

৬১ আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন, আবুল আলা মওদূদী, আল-রিবা, অনুবাদ মুহাম্মদ আসিম আল-হাদ্দাদ, বৈরুত, ১৯৭০।

৬২ নিদাউল ইসলাম ম্যাগাজিন, 'প্রিন্সিপালস অব ইসলামিক ব্যাংকিং', সংখ্যা ১০, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৫।

নেয়া যাবে না।"[৬৩] সংশ্লিষ্ট বা পরোক্ষ সুবিধা গ্রহণ না করার ওপর যে জোর দেয়া হয়েছে সেখান থেকে এসেছে এই নীতি।

৬.২. ব্যবসায়িক উদ্যোগের অর্থ ঋণ দেয়া হলে ঋণদাতাকে অবশ্যই এর লাভ-লোকসানে অংশীদার হতে হবে

ইসলাম একজন মুসলমানকে ঋণদাতা হওয়ার বদলে তার অর্থ বিনিয়োগ এবং অংশীদার হয়ে লাভ-লোকসান ভাগাগাগি করে নিতে উৎসাহিত করে। শরী'আহ্ মতে, ইসলামী অর্থায়নের ভিত্তি হলো পুঁজি সরবরাহকারী ও পুঁজি ব্যবহারকারী ব্যবসায়িক উদ্যোগে ঝুঁকির সমান অংশীদার হবেন। এটা হতে পারে শিল্পোদ্যোগ, খামার, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ কেনাবেচার উদ্যোগ। আমরা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে আমানতকারী, ব্যাংক এবং ঋণগ্রহীতা সবাইকে আর্থিক ব্যবসা উদ্যোগের ঝুঁকি এবং মুনাফায় অংশীদার হতে হবে। এটা সুদি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সব চাপ বহন করতে হয় ঋণগ্রহীতাকে : তাকে সম্মত হারে সুদসহ ঋণ ফেরত দিতে হয়, ব্যাংকের অর্থায়ন করা উদ্যোগ সফল বা ব্যর্থ যা-ই হোক না কেন তাতে কিছু যায়-আসে না। ইসলামের নীতি হলো সমাজের উপকারার্থে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। ইসলাম কারো জন্য এমন ফাঁক রাখতে চায় না, যে বিনিয়োগ ও ঝুঁকি না নিয়ে ব্যাংকে টাকা জমা রেখে কেবল তা বাড়িয়ে চলবে (ব্যাংক দেউলিয়া না হওয়া পর্যন্ত)।

৬.৩. টাকা থেকে টাকা বানানো ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়

ইসলাম অর্থকে শুধু বিনিময়ের একটি মাধ্যম বলে মনে করে। এর মাধ্যমে কোনো জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। এর নিজস্ব কোন মূল্য নেই। তাই শুধু ব্যাংকে রাখা বা কাউকে ধার দেয়ার মতো সুদি পন্থা অবলম্বন করে এটি নিজে নিজে বেড়ে যেতে পারে না। কোনো উৎপাদনশীল উদ্যোগে অর্থায়নের কাজে ব্যবহৃত অর্থের চেয়ে মানবিক প্রচেষ্টা, উদ্যোগ এবং ঝুঁকি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হলেই তাকে সম্ভাব্য পুঁজি হিসেবে বিবেচনা করেন মুসলিম আইনবিদেরা। একইভাবে ব্যবসায় কোনো ঋণ দেয়া হলে তা ব্যবসার একটি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে, পুঁজি হিসেবে নয়। তাই এখান থেকে কোনো মুনাফা (অর্থাৎ সুদ) পাওয়া যাবে না। মুসলমানদেরকে কেনাকাটায় উৎসাহিত এবং অর্থকে অলস ফেলে রাখতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থ জমিয়ে রাখা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামে অর্থ দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা বুঝায়। তাই পণ্য বা সেবা কেনার মতো মধ্যবর্তী ধাপগুলো অতিক্রম না করে অধিক ক্ষয়ক্ষমতা (অর্থ) লাভের মতো কাজে এটা ব্যবহৃত হতে পারে না।

---

৬৩ আল-মাসরি, আল জামি ফি উসুল আল-রিবা, প্রাগুক্ত, ১৯৯১, পৃ: ২৫৬।

৬.৪. ঘারার (প্রতারণা) এবং মাইসির (জুয়া) নিষিদ্ধ

কখনো কখনো ঘারার শব্দের অর্থ প্রতারণার পরিবর্তে 'অনিশ্চয়তা' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। ঘারার-এর ব্যাপারে ইসলামী আইন সুস্পষ্ট, তা হলো চুক্তিপত্রে এমন কিছু থাকতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ এমন কিছু বিক্রি করতে পারবে না যা সম্পর্কে ক্রেতা কিছু জানে না। কারণ এটা একধরনের প্রতারণা। একইভাবে কেউ অজ্ঞাত গুণসম্পন্ন কিছু বিক্রি করতে পারে না, যেমন- জন্ম হয়নি এমন কোনো বাছুর। কারণ, এখানে বিক্রেতা বা ক্রেতা কেউই জানেন না আসলে তারা কী কেনাবেচা করছে।

মাইসিরকে ইসলাম অন্যের সম্পদ আত্মসাতের মতো একটি অবিচার হিসেবে গণ্য করে।[৬৪] রিবার ধারণার সঙ্গে এর অনেক মিল রয়েছে। জুয়া বা ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার ওপর বাজি ধরা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার মানে হলো, যেকোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তিটি হতে হবে অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি এবং কল্পনা (ফটকাবাজি) থেকে মুক্ত। চুক্তির পর লেনদেনের ফলে এর মূল্য কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর সম্যক ধারণা থাকতে হবে।[৬৫] যদিও কোনো পক্ষই নিশ্চিত মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। 'লাভ অনিশ্চিত'– এই নীতির ভিত্তিতে চুক্তিটি করা হয়। এই নীতির সরাসরি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে ধার নেয়া অর্থের অতিরিক্ত কিছু পরিশোধ করা হবে, গ্রাহকের কাছ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি নেয়ারও অনুমতি নেই। এই নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা হলো দুর্বলকে সবলের শোষণ থেকে রক্ষা করা। তাই বিকল্প ও ভবিষ্যৎ বিবেচনায় নেয়া অনৈসলামিক এবং আগাম দরে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনও একই। কারণ এখানে দর নির্ধারিত হয় সুদের পার্থক্য নির্ণয়ের মাধ্যমে।

তবে এটা মনে করার কারণ নেই যে ভবিষ্যৎ ফলাফল অজানা বিধায় কোনো চুক্তিকে অকার্যকর বলে ধরে নেয়া হবে। মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যৎ সর্বদা অজানা। কিন্তু বিনিয়োগ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলে কেউ মুনাফা করতে পারবে কি না তা জানতে না পারা, আর কোথায় বিনিয়োগ চুক্তির ক্ষেত্রটিই অনিশ্চিত সে বিষয়ে জ্ঞান না থাকা এক কথা নয়।[৬৬]

বহু মুসলিম বিশেষজ্ঞ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে ঋণিতার (indebtedness) ইনডেক্সেশন অনুমোদন করেননি এবং কর্জে হাসানার মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা করেছেন। ওইসব বিশেষজ্ঞের মতে, ঋণদাতা ঋণ দেন আল্লাহ্‌র ফজল লাভের জন্য এবং তিনি শুধু আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে পারেন। তবে এমন অনেক লেনদেন আছে যেগুলো 'ঘারার'

---

৬৪ আল-কুরআন, ২:২১৯

৬৫ আহমদ, আবু ওমর ফারুক, Legislations and Issues on Islamic Banking in Bangladesh, তরুণ বুদ্ধিজীবীদের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক ফোরাম অন ইসলামিক ইকোনমিকস, ফিন্যান্স অ্যান্ড বিজনেস সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধ, লংকাভি, এপ্রিল ১৮-২০, ২০০৬।

৬৬ আল দিউয়ানি, তারেক, The Problem With Interest, লন্ডন, ১৯৯৭, পৃ: ১৪৩-১৪৪।

নীতিমালার ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়, যেমন- বাই মুয়াজ্জাল বা বিলম্বিত পরিশোধ সংবলিত বিক্রি, বাই আল-সালাম বা সরবরাহসহ পণ্য বিক্রি এবং ইজারা বা লিজিং। অবশ্য, এ ধরনের চুক্তির জন্য এমন আইনি ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে ঝুঁকি থাকে সর্বনিম্নপর্যায়ে।[৬৭]

৬.৫. ইসলামে নিষিদ্ধ বা নিরুৎসাহিত করা হয়নি কেবল এমন পণ্য বা উদ্যোগে বিনিয়োগ

শরী'আহ্ আইন অনুযায়ী ইসলামে নিষিদ্ধ, এমনকি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এমন পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালকোহল কেনাবেচার কাজে কোনো ইসলামী ব্যাংক অর্থায়ন করতে পারে না। ইসলামী ব্যাংক ক্যাসিনো নির্মাণের জন্য 'রিয়েল এস্টেট লোন' দিতে পারে না। এ ব্যাংক সুদের জন্য অন্য ব্যাংককে টাকা ধার দিতে পারে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন একটি 'ইকুইটি শেয়ারিং' (equity-sharing) এবং স্টেক-টেকিং (stake-taking) ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য কাজ করে। পরিবর্তনশীল মুনাফা নীতির (principle of variable return) ভিত্তিতে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি সুনির্দিষ্ট বা সাধারণ, ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক, বেসরকারি বা সরকারি প্রকল্পের প্রকৃত উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। চাহিদা অনুযায়ী অনেকভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে, কিন্তু নীতি হবে ইকুইটি ও লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব এবং তা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো সাধারণ ঋণ-সুদ সম্পর্কের ভিত্তিতে হবে না।

৭. ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকিং : একটি তুলনা

বর্তমানে যে ধরনের ব্যাংকিংয়ের অস্তিত্ব দেখা যায় তার উৎপত্তি তুলনামূলক সাম্প্রতিক। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা আবির্ভাবের আগে সরাসরি অর্থায়ন রীতির প্রচলন ছিল। সেখানে পুঁজির মালিক সরাসরি পুঁজি ব্যবহারকারীর সঙ্গে লেনদেন করত। তহবিল স্থানান্তরের গতানুগতিক ধরন ছিল সঞ্চয়কারী থেকে বিনিয়োগকারী। বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থায়নের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থায়ন একটি অপর্যাপ্ত প্রক্রিয়া বলে প্রমাণিত হয়। তখন সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের জন্য দৃশ্যপটে ব্যাংকের আবির্ভাব ঘটে। অধিকন্তু আধুনিক কালে সেগুলো এমন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয় যা ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের যেকোনো একটি বা সবগুলো সম্পাদন করে থাকে, যেমন : গ্রহণ, সংগ্রহ, স্থানান্তর, পরিশোধ, ঋণদান, বিনিয়োগ, কারবার, বিনিময় এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে মানি সার্ভিসিং

---

৬৭ আহমদ, আবু ওমর ফারুক, Problems of Islamic Banking in Bangladesh, ইসলামিক রিসার্চ ব্যুরোতে উপস্থাপিত নিবন্ধ, ঢাকা, বাংলাদেশ, জানুয়ারি ২১, ২০০১।

(servicing money) ইত্যাদি।[৬৮] আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ব্যাংক বলতে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা সাধারণ জনগণকে আমানত সুবিধা জোগান দেয়।

আধুনিক ব্যাংকিং ও অর্থায়নব্যবস্থার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সম্ভবত সম্পদ সঞ্চয়ে ক্রেডিট ইন্সটিটিউশনগুলোর ব্যবহার। সঞ্চয় তহবিলভিত্তিক ঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান। ব্যাংক ডিপোজিট বা জমা করার মাধ্যমে সম্পদের সঞ্চয় আধুনিক বিশ্বের একটি গতিশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ কেবল এগুলোর আমানতের প্রকৃত মূল্যের সেবাই পায় না, পাশাপাশি ব্যাংক ডিসকাউন্ট ও রিজার্ভব্যবস্থার মাধ্যমে এসব তহবিলের কার্যকর ব্যবহার বহু গুণ বাড়িয়ে তোলে, যার উদ্ভব অতি সম্প্রতিক।[৬৯] বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এসব কর্ম সম্পাদন করে এবং এগুলোকে বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তাই ব্যাংক আধুনিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তারা প্রচুর কর্মসংস্থান এবং আয় সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করে- যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে। ব্যাংকের আরেকটি সামাজিক কল্যাণের দিক হলো আমানতকারীদের মুনাফা প্রদানের ব্যবস্থা। এরা মূলত ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী। যাদের মধ্যে রয়েছে সমাজের দুর্বলতর অংশ যেমন : বিধবা, প্রতিবন্ধী, অনাথ এবং সেসব বয়স্ক মানুষ যারা তাদের সঞ্চয়কে কোনো লাভজনক কাজে লাগাতে অক্ষম। অধিকন্তু ব্যাংক হলো ঋণের সৃষ্টিকারী (manufactories of credit),[৭০] যা সমাজের সেবা করে এবং শিল্পবাণিজ্যের চাকা সচল রাখে। বিনিয়োগ সুবিধা এবং সঞ্চয়ের নিরাপদ সংরক্ষণের প্রস্তাব করে এগুলো সঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টি এবং সম্পদ জমিয়ে রাখা বা বাড়তি সম্পদের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে। এতে বিনিয়োগ ও পুঁজির প্রবৃদ্ধি জোরদার হয়। একটি বিচক্ষণ ব্যাংকিং পলিসি অর্থনৈতিক সঙ্কটের ধাক্কা সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অন্য দিকে, ব্যাংকিং ব্যবস্থা যদি খারাপভাবে গড়ে ওঠে বা অপরিপক্ব হাতে সামলানো হয় তাহলে তা শিল্প ও বাণিজ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে, এমনকি পুরো অর্থনীতির জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার সবচেয়ে অগ্রসর অংশ হলো ইসলামী ব্যাংকিং। এই ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তিটি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চলকগুলোর আন্তঃক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্য দিকে, প্রচলিত অর্থায়ন ব্যবস্থা মূলত লেনদেনের অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রেক্ষাপটের প্রতি মনোযোগ দেয়। ইসলামী ব্যবস্থা সমাজের

---

৬৮ ওয়েলফেল, চার্লস জে. এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, শিকাগো, ১৯৯৩, পৃ: ৬৯।

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫১। নিফফিন, ডব্লিউ.এইচ., How to Use Your Bank, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃ: ৩১।

৭০ নিফফিন, ডব্লিউ.এইচ., How to Use Your Bank, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃ: ৩১।

সার্বিক ভালোর জন্য সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা জোরদারের জন্য একই সঙ্গে নৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াবলির ওপর সমান গুরুত্ব দেয়। দুই ব্যবস্থার মধ্যে মিলের দিকগুলো হলো ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো শরী'আহ্ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও এগুলো প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যাংকের মতো একই ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করে, যেমন : এগুলো অর্থনৈতিক লেনদেনব্যবস্থা পরিচালনার পাশাপাশি আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।[৭১] আর্থিক বাজারের অসম্পূর্ণতা কাজে লাগানের জন্য উভয় ব্যবস্থায় একই কারণে এগুলো প্রয়োজন। এসব অসম্পূর্ণতার মধ্যে রয়েছে আর্থিক দাবির অপূর্ণ বিভাজ্যতা (imperfect divisibility of financial claims), অসম্পূর্ণ তথ্য, অনুসন্ধান ও স্বোপার্জন (acquisition) কার্যসম্পাদন ব্যয়, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি ইউনিটের মাধ্যমে বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অর্থনৈতিক মানদণ্ড সৃষ্টি।[৭২] ইসলামী ব্যবস্থায় শরী'আহ্ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিপক্ষের মতো একই রকম অর্থনৈতিক মানদণ্ড প্রদর্শন করবে বলে যৌক্তিকভাবে আশা করা যায়। প্রচলিত ব্যবস্থার মতো ইসলামী ব্যবস্থাও ডিপোজেটরি ফিনান্সিয়াল ইন্টারমেডিয়ারি (depository financial intermediarie) ব্যবসায়িক দায়গুলোকে এমন বিচিত্র বাধ্যবাধকতায় রূপান্তরিত করে যা উদ্বৃত্ত ইউনিটগুলোর চাহিদা ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায়।

অন্য দিকে, কার্যপ্রণালির প্রকৃতির কারণে প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিপরীতে প্রচলিত ব্যাংকিংকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে "ঋণদান বা বিনিয়োগের জন্য অর্থ গ্রহণ, জনগণের অর্থ গচ্ছিত রাখা, যা চাহিদা অনুযায়ী বা অন্য কোনোভাবে ফেরতযোগ্য এবং চেক, ড্রাফ্ট, অর্ডার বা অন্য কোনোভাবে প্রত্যাহারযোগ্য।"[৭৩] ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকসের (আইএআইবি) সংজ্ঞা অনুযায়ী : "ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ধরনের ব্যাংকিং ধারণা বাস্তবায়ন করছে, যা আর্থিক ও অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ইসলামী শরী'আহ্ বিধান মেনে চলে। অধিকন্তু, এই ব্যাংক এমনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাতে বাস্তব জীবনে ইসলামী নীতিমালার প্রতিফলন ঘটে। এই ব্যাংক একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে। তাই, জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি এর অন্যতম লক্ষ্য।"[৭৪] অতএব এটা সুস্পষ্ট যে মিশন ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ

---

৭১ আহমদ, আবু ওমর ফারুক, Islamic Banking in Bangladesh, অপ্রকাশিত এলএলএম থিসিস, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনি, অস্ট্রেলিয়া, ২০০৩।

৭২ ইকবাল, জুবাইর ও মিরাখোর, আব্বাস, Islamic Banking, ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯৮৭, পৃঃ ৩।

৭৩ মিনায়ী, আনোয়ার আহম্মেদ, Islamic Banking – Where Are We Going Wrong?, নিউ হরাইজন, লন্ডন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃঃ ৩।

৭৪ আইএআইবি (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস্), ডাইরেক্টরি অব ইসলামিক ব্যাংকস্ অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, জেদ্দা, ২০০১।

আলাদা। ফলে সমাজের প্রতি ইসলামী ব্যাংকের বাধ্যবাধকতা প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে অনেক বেশি। এর কারণগুলো হলো :

ক. সুনির্দিষ্ট আদর্শিক মিশন অর্জনের জন্য পরিচালিত হয় ইসলামিক ব্যাংকিং। আর তা হলো, আল্লাহ সব সম্পদের স্রষ্টা এবং চূড়ান্ত মালিক; ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমাজে কেবল তার প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করবে। তাই ইসলামী ব্যাংক নিজের খেয়ালখুশি মতো কিছু করতে পারে না। তার বদলে একে অর্থনৈতিক কার্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

খ. মেধা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো জামানত দেয়ার সামর্থ্য নেই এমন ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান। এর মাধ্যমে সমাজের তৃণমূল ভিত্তিকে শক্তিশালী করা। এবং,

গ. অর্থনৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের 'শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং' (sharing and caring) চেতনার ভিত্তিতে সমাজে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি।

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিরঙ্কুশভাবে এক দিকে আমানতকারী ও ব্যাংক এবং অন্য দিকে ঋণগ্রহীতা ও ব্যাংকের মধ্যে গ্রহীতা-দাতা সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুদকে বিবেচনা করা হয় ঋণের মূল্য (price of credit) হিসেবে, যা অর্থের সুযোগ-মূল্যের (opportunity cost) প্রতিফলন। অন্য দিকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ঋণের লেনদেন যেহেতু চার্জবিহীন তাই কোনো জরুরি প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। সুদের ভিত্তিতে টাকা ধার দেয়া হলে একধরনের জুলুম করা হয়। তাই এ ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম নীতি হলো "কারো প্রতি অবিচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অবিচার করবে না" (২:২৭৯)। তাই ইসলামী কাঠামোর আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়।

ইসলামে আর্থিক লেনদেনের দ্বিতীয় নীতি হলো, ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া কোনো প্রতিদানও পাওয়া যাবে না। শ্রম এবং পুঁজি উভয় ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য। কোনো কাজে শ্রম প্রযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যেমন এর পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না, তেমনি ব্যবসায়িক ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া কোনো পুঁজি প্রতিদানের যোগ্য হতে পারে না।[৭৫]

অতএব ইসলামী কাঠামোর আওতায় যে আর্থিক মধ্যস্থতার উন্নয়ন ঘটেছে উপরোক্ত দুই নীতি হলো তার ভিত্তি। এর ফলে ইসলামে আর্থিক সম্পর্কের প্রকৃতি হলো অংশগ্রহণমূলক। এখানে সুদি প্রতিষ্ঠান লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণের নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এর মানে হলো স্থির

৭৫ আহমদ, আউসাফ, The Evaluation of Islamic Banking in Encyclopedia of Islamic Banking, লন্ডন, ১৯৯৫, পৃ: ১৭।

হারে সুদের বদলে এখানে বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল হারে মুনাফা পাওয়া যায়।[৭৬]

গতানুগতিক সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পাই তার প্রধান দিকগুলো হচ্ছে : (ক) ইসলামী ব্যাংকিং একান্তভাবেই একটি লাভ ও লোকসান ভাগাভাগিমূলক ব্যবস্থা এবং এটি কোন সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নয়; এবং (খ) এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় বিনিয়োগ (প্রচলিত ধারণার ঋণ ও আগাম) একই সঙ্গে বিনিয়োগকারী ও স্থানীয় কমিউনিটির জন্য সুফল বয়ে আনবে।

প্রচলিত ব্যাংকিং এবং ইসলামী ব্যাংকিয়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটি ছকের মধ্যে সাজাতে পারি :

প্রচলিত ব্যাংকিং	ইসলামী ব্যাংকিং
১. প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয় মানবরচিত নীতিমালার ভিত্তিতে।	১. ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয় ইসলামের শরী'আহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে।
২. বিনিয়োগকারীদের পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়া হয়।	২. এখানে পুঁজিদাতা (বিনিয়োগকারী) এবং পুঁজিব্যবহারকারীর (উদ্যোক্তা) মধ্যে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেয়ার কথা বলা হয়।
৩. কোনো বিধিনিষেধে আবদ্ধ না থেকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন এর লক্ষ্য।	৩. শরী'আহ্ বিধিবিধানের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন এর লক্ষ্য।
৪. এটি যাকাত নিয়ে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে না।	৪. আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবামুখী কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে।
৫. প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মৌলিক কাজ হলো অর্থ লগ্নি করা এবং সুদসহ তা আদায়।	৫. ইসলামী ব্যাংকগুলোর মৌলিক কাজ হলো অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় অংশগ্রহণ।
৬. ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করলে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ।	৬. প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের ক্ষেত্র বিস্তৃত। পরিশেষে এটি একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

৭৬ মাংলা, আই.ওয়াই., এবং উপ্পল, জে.ওয়াই., Islamic Banking: a Survey and Some Operational Issues, ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের গবেষণা, খণ্ড ২, ১৯৯০, পৃ: ১৭৯, ১৮৫, ২১৫।

প্রচলিত ব্যাংকিং	ইসলামী ব্যাংকিং
৭. খেলাপি হলে এটি বাড়তি অর্থ (চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ) ধার্য করতে পারে।	৭. খেলাপিদের ওপর বাড়তি কোনো অর্থ ধার্য করার বিধান ইসলামী ব্যাংকগুলোতে নেই।
৮. প্রায়ই ব্যাংকের নিজস্ব সুদ-এর বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে। ইকুইটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার কোনো প্রচেষ্টা এখানে নেই।	৮. এটি জনগণের স্বার্থকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়। ইকুইটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য।
৯. সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য অর্থবাজার থেকে ধার নেয়া তুলনামূলক সহজ।	৯. ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য অর্থবাজার থেকে ধার নেয়া তুলনামূলক কঠিন।
১০. যেহেতু মুনাফার বিষয়টি আগেভাগে নির্ধারিত, তাই প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞপর্যায়ের দক্ষতা উন্নয়নে কম গুরুত্ব দেয়া হয়।	১০. যেহেতু লাভ-লোকসান ভাগাভাগি করা হয় তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়নে সর্বোচ্চ মনযোগ দেয়।
১১. প্রচলিত ব্যাংকগুলো ক্লায়েন্টের ঋণপরিশোধযোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।	১১. অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক প্রকল্পের বাস্তব উপযোগিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।
১২. প্রচলিত ব্যাংকের মর্যাদা এর ক্লায়েন্ট তথা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে।	১২. ইসলামী ব্যাংকের মর্যাদা এর ক্লায়েন্ট তথা অংশীদার, বিনিয়োগকারী ও লেনদেনকারীদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে।
১৩. প্রচলিত ব্যাংককে তার প্রত্যেক ডিপোজিটরকে অর্থ ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টি দিতে হয়।	১৩. কঠিনভাবে বলতে গেলে, ইসলামী ব্যাংক তার সব ডিপোজিটরকে অর্থ ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টি দিতে পারে না।

ইসলামী ও প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও কিছু বিষয়ে উভয়ে অভিন্ন। ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থ ধার দেয় না, ফলে সুদ আরোপেরও প্রয়োজন পড়ে না। তাই এগুলো অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা লাভের জন্য কিছু বিনিয়োগ কৌশল উদ্ভাবন করে, যেমন– বাই মুরাবাহা, মুশারাকা ও মুদারাবা। এই প্রতিটি কৌশলেই লাভজনকতা (profitability) ও কিস্তিতে পরিশোধের বিষয়টি আগেই চিহ্নিত করা হয়। অধিকন্তু কিছু ইসলামী ব্যাংক সুনির্দিষ্ট ধরনের ইজারা (লিজিং) কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৭৭] প্রচলিত ব্যাংকের এমন অনেক সেবা আছে যেগুলোর সঙ্গে সুদ জড়িত নয়, যেমন : লেটার অব ক্রেডিট, সংগ্রহ (collection), বৈদেশিক

৭৭ আহমদ, আবু ওমর ফারুক এবং হাসান, এম. কবির, The Time Value of Money Concept in Islamic Finance, আমেরিকান জার্নাল অব ইসলামিক সোস্যাল সায়েন্স, হার্নডন, ইউএসএ, ২৩, ৬৬-৮৯।

মুদ্রা, আর্থিক পরামর্শ (financial advising) প্রভৃতি। ইসলামী ব্যাংকগুলো এসব কার্যক্রমও পরিচালনা করে। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য বাজারে ইসলামী ব্যাংকের অর্থের একটি বড় অংশ পরিচালনা করে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে সম্পদের অনুপাতে মুনাফাকে (Returns on Assets) বিবেচনা করছে, তাহলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো, তথা ইসলামী ব্যাংক, প্রচলিত ব্যাংক ও এর গ্রাহক, উক্ত লক্ষ্য হাসিলের জন্য পণ্য বিনিময়ের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।[৭৮]

৮. ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আর্থসামাজিক ফলাফল

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্ভাব্য আর্থসামাজিক ফলাফল নিয়ে সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে, অর্থায়নের বিভিন্ন ধরন একই সঙ্গে কাজ করলেও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পিএলএস (profit and loss sharing) ধরনের অর্থায়নই ভবিষ্যতে প্রভাব বিস্তার করবে।[৭৯] ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে এমন আলোচনায় যেসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়া হচ্ছে সেগুলো হলো :

ক) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর প্রভাব

ইসলামী ব্যাংকিং-বিষয়ক রচনা দিতে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যে, সুদমুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা সঞ্চয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ এখানে মুনাফার অনিশ্চয়তা বেড়ে যায়।[৮০] মুসলিম অর্থনীতিবিদেরা বলেন, প্রকৃত আয় অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন- ইউটিলিটি ফাংশনের ধরন এবং এর ঝুঁকির উপাদানসমূহ (risk properties)।[৮১]

আরো যুক্তি দেখানো হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হলে তা সঞ্চয়ের জন্য বর্ধিত হারে মুনাফার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। ফলে, পিএলএস-ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার বর্ধিত মাত্রার ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে সঞ্চয়ের ওপর বর্ধিত হারে মুনাফা প্রদানের মাধ্যমে। ফলে সার্বিক সঞ্চয়ের মাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে অথবা সঞ্চয় বেড়েও যেতে পারে।[৮২]

---

৭৮ কাসিম, এম. কাসিম, Islamic Banking, New Opportunities for Cooperation Between Western and Islamic Financial Institutions, বাটারওয়ার্থস সম্পাদিত Islamic Banking and Finance, লন্ডন, ১৯৮৬, পৃ: ১৯-২০।

৭৯ আহমদ, আবু ওমর ফারুক এবং হাসান, এম. কবির, Regulation and Performance of Islamic Banking in Bangladesh, থান্ডারবার্ড ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস রিভিউ, ৪৯, ২০০৭।

৮০ প্রেয়র, ফ্রেডারিক এল., The Islamic Economic System, জার্নাল অব কমপারেটিভ ইকোনমিকস, খণ্ড ১৯, ১৯৮৫, পৃ: ১৯৭।

৮১ দেখুন, জুবাইর ইকবাল এবং আব্বাস মিরাখোর, ইসলামিক ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৮২ হক, নাদিম উল এবং আব্বাস মিরাখোর, Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment in an Interest Free Economy, মহসিন এস. খান এবং আব্বাস মিরাখোর সম্পাদিত Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, হিউস্টন, ১৯৮৭, পৃ: ১৪১-১৬৬।

বিনিয়োগের উপর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্ভাব্য প্রভাবের ক্ষেত্রে মুসলিম অর্থনীতিবিদেরা দেখান যে সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের জায়গায় পিএলএস চালু হলে বিনিয়োগ তহবিলের চাহিদা সরবরাহ উভয়ই বেড়ে যেতে পরে। প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হিসাবের জন্য যেহেতু প্রতিষ্ঠানের পুঁজির স্থির ব্যয় (fixed cost) মেটানোর প্রয়োজন হবে না তাই বিনিয়োগ তহবিলের চাহিদা বেড়ে যেতে পারে।[৮৩] পুঁজির প্রান্তিক পণ্য (marginal product of capital) এমন পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে যেখানে পুঁজির স্থির ব্যয় মেটানোর টানাপড়েন ছাড়াই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা যায়। পিএলএস-ভিত্তিক ব্যাংকের ঝুঁকি সামাল দেয়ার (risk absorbing capacity) ক্ষমতা বেশি বিধায় এটি অধিকসংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে বিনিয়োগের সামর্থ্য রাখে।[৮৪]

খ) প্রবৃদ্ধি হার ও প্যাটার্নের ওপর প্রভাব

অনেক অর্থনীতিবিদ দেখান যে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পিএলএস-ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের প্রত্যাশিত অনুকূল প্রভাবের কারণে অর্থনীতিতে স্বতন্ত্র প্রবৃদ্ধিমুখী প্রবণতা সৃষ্টি হবে।[৮৫] ইসলামী ব্যবস্থার আওতায় ঝুঁকিপূর্ণ পুঁজির প্রাপ্যতা বেড়ে গেলে তা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা জোরদার করবে, যা প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে হবে আরেকটি ইতিবাচক ফ্যাক্টর। ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য (purposes) অর্জনের জন্য প্রবৃদ্ধি যেন হয় ব্যাপকভিত্তিক এবং ব্যাংকের সম্পদের যেন সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার হয় সে লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো সর্বদা সুনির্বাচিত আর্থিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির ধরনকে প্রভাবিত করতে চায়।

গ) বণ্টন দক্ষতার ওপর প্রভাব

অর্থনীতি নিয়ে মুসলিম অর্থনীতিবিদদের লেখা সাহিত্যগুলোতে ইসলামের লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বভিত্তিক অর্থায়নব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টনমূলক দক্ষতার বিষয়টি বিতর্কের একটি বড় ক্ষেত্র।[৮৬] বলা হয় যে, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনেক বেশি দক্ষ।

---

৮৩ আহমেদ, আবু ওমর ফারুক, ইসলামী অর্থায়নবিষয়ক ষষ্ঠ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ফোরামে উপস্থাপিত নিবন্ধ, Islamic Banking in Bangladesh: Legal and Regulatory Issues, মে ৮-৯, ক্যামব্রিজ, এমএ।

৮৪ এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা : দেখুন, ইতঃপূর্বে উল্লিখিত নাদিম উল হক এবং আব্বাস মিরাখোর-এর গবেষণা এবং এম. উমর চাপড়া, Towards a Just Monetary System, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১-১১৭, এবং নেজ্জাতুল্লাহ সিদ্দিকী, Issues in Islamic Banking, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৮-৮৯।

৮৫ উদাহরণস্বরূপ দেখুন, চাপড়া, এম. উমর, Towards a Just Monetary System, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২২-১২৫।

৮৬ বিশেষভাবে দেখুন, এম. আনাস জারকা, Capital Allocation, Efficiency and Growth in an Interest-Free Islamic Economy, জার্নাল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ১৯৮২, পৃ: ৪৩-৫৫।

এই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা (general proposition)। আর তা হলো, বিনিয়োগ বিকল্প সৃষ্টি করে এমন কোনো আর্থিক পদ্ধতিতে পুরোপুরি উৎপাদনশীলতা ও মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হলে সেখানে বণ্টনমূলক উন্নতি সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর এই প্রতিজ্ঞাই ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর (cornerstone)। মুসলিম পণ্ডিতরা তাদের লেখনীতে জোর দিয়ে বলেছেন, সুদের অস্তিত্ব না থাকার মানে এই নয় যে সুদমুক্ত অর্থনীতিতে ভবিষ্যৎ অর্থপ্রবাহের মূল্য হিসাবের কৌশল হিসেবে ডিসকাউন্টিং (discounting) পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না। তারা আরো যুক্তি দেখান যে, এমনকি সুদভিত্তিক অর্থনীতিতেও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সুদের হার যথাযথ ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর (discount factor) নয়। অনিশ্চিত অবস্থায় ইকুইটি প্রতি মুনাফার হার হলো প্রকৃত ডিসকাউন্ট রেট। বাস্তব বিশ্ব যেহেতু অনিশ্চয়তায় ভরা তাই ঝুঁকি না নিয়ে কোনো অর্থনীতিতেই প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের বিনিয়োগে অর্থপ্রবাহ অবশ্যই 'ডিসকাউন্ট' করতে হবে এবং তাকে কেবল ঝুঁকিবিহীন সুদের হারের ভিত্তিতে করলেই চলবে না, উদ্যোক্তা পুঁজির (venture capital) সত্যিকার সম্ভাবনা মূল্য কতটুকু, তার ভিত্তিতেও করতে হবে।[৮৭]

ঘ) ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে লেখালেখিতে কিছু লেখক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তা হলো সুদমুক্ত ব্যাংকিং থেকে পিএলএস-ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে যাওয়া হলে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এর গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় আমানত দায়ের উল্লিখিত মূল্য (nominal value) স্থির বা নির্ধারিত এবং এখানে সব ঋণ এবং আগাম ফেরত পাওয়া যাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এতে সম্পদের ওপর যে অভিঘাত আসবে তার ফলে সম্পদ ও দায়ের মধ্যে বিপরীতমুখী চলন (divergence) সৃষ্টি হবে। ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আস্থা হারাতে পারে এবং যা ব্যাংকিং সঙ্কটের জন্ম দেবে। অন্য দিকে পিএলএস-ভিত্তিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ আমানতের নমিনাল ভ্যালু নিশ্চিত (guaranteed) নয় এবং সম্পদের অবস্থার ওপর আঘাত দ্রুততার সঙ্গে বিনিয়োগ আমানতের মূল্য দ্বারা নিলীন (absorbed) হয়ে যায়। ফলে ব্যাংকের ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি সর্বনিম্নপর্যায়ে নেমে আসে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা জোরদার হয়।[৮৮]

---

৮৭ এই ধারণার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন, জিয়াউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam বইয়ে এম. আনাস জারকার নিবন্ধ, An Islamic Perspective on the Economics of Discounting in Project Evaluation, ১৯৮৩, পৃ: ২০৩-২৩৪।

৮৮ দেখুন, মহসিন এস. খান ও আব্বাস মিরাখোর সম্পাদিত Islamic Interest Free Banking: A Theoretical Analysis বইয়ের নিবন্ধ Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, ১৯৮৭, পৃ: ১৫-৩৫।

ঙ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব

মুসলিম পণ্ডিতরা ইসলামী ব্যাংকিং-বিষয়ক রচনাদীতে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে কিছু ক্ষেত্রে সুদের পরিবর্তে পিএলএস আরোপ করা হলে তা পুরো অর্থব্যবস্থাকে অত্যন্ত অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। কারণ অর্থনীতির একটি অংশে গোলযোগ দেখা দিলে তা বাকি অংশেও ছড়িয়ে পড়বে।[৮৯] তারা যে আশঙ্কার কথা বলছেন তা সত্যি বলে মনে হয় না। অন্যত্র তারাই বলছেন যে সুদ বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতির অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতাকে ক্রমেই সুদৃঢ় করে তুলবে। উল্লেখ করা হয় যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো সুদভিত্তিক ঋণ অর্থায়ন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সুদভিত্তিক ব্যাংক যখন তাদের অর্থায়ন করা কোনো ব্যবসাকে লোকসান গুনতে দেখে তারা সহায়তা কমিয়ে দেয় এবং ঋণ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়। এ পরিণতিতে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এতে বেকারত্ব বেড়ে যায় যা চাহিদাকে আরো কমিয়ে দেয় এবং এর প্রভাব ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে। অন্য দিকে ইসলামী ব্যাংক লোকসানের অংশ বহন করতে প্রস্তুত থাকে। যা ব্যবসায়িক মন্দার প্রাবলত্য কমিয়ে দেয় এবং উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ না হয়ে কঠিন সময় পাড়ি দেয়ার যোগ্য হতে সহায়তা করে। তাই, ইসলামী ব্যাংকিংকে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পরিবর্তে স্থিতিশীলতার প্রবর্তক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।[৯০]

৮. উপসংহার

হ্যান্ডবুক অব ইসলামিক ব্যাংকিং (এইচআইবি)[৯১]-এ উল্লিখিত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো, অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য এমন আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের উন্নয়ন বা সৃষ্টি যা ইসলামী আইন ও প্রথা, তথা শরী'আহ্‌র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হ্যান্ডবুকে উল্লেখ করা হয়েছে : "ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর মতো মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয়। মুসলমানদের কাছে আর্থ-সামাজিক সুফল পৌঁছে দেয়াই এর আসল লক্ষ্য।"[৯২]

অধিকন্তু ইসলামের দার্শনিক ভিত্তিকে সুনিশ্চিত করে ইসলামী ব্যাংকিং। আল্লাহ এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও চূড়ান্ত মালিক এবং মানুষ বা প্রতিষ্ঠান সমাজে তার প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করে। তাই ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাই অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ হলো সমাজের সর্বোচ্চ সুফল ও কল্যাণ অর্জনের জন্য সামাজিক হাতিয়ার।

---

৮৯ দেখুন, এ.এন.এইচ. নাকভী, Ethics and Economics: An Islamic Synthesis, লিচেস্টার, ১৯৮১, পৃ: ১৩৬।

৯০ দেখুন, এম. আনাস জারকা, Stability in an Interest-Free Islamic Economy: A Note, পাকিস্তান জার্নাল অফ অ্যাপ্লাইড ইকোনমিকস, উইন্টার ১৯৮৩, পৃ: ১৮১-১৮৮।

৯১ এইচআইবি (হ্যান্ডবুক অব ইসলামিক ব্যাংকিং), আইএআইবি, জেদ্দা, ১৯৮২, খণ্ড ৫, পৃ: ১৫৩।

৯২ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৩-৫৫।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো অর্থায়ন, ব্যাংকিং ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক লেনদেনে ইসলামী ঐতিহ্য, নীতি ও বিধানের প্রয়োগপদ্ধতির উন্নয়ন, লালন ও বিকাশ এবং ইসলামী নীতিভিত্তিক আর্থিক পণ্য উন্নয়ন।

এই নিবন্ধের আলোচনায় আরো বলা হয়েছে, ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধান এবং একজন মুসলমানের জীবনের সব কর্মকাণ্ড এর ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। তাই একজন মুসলমানের জন্য ব্যাংকিংসহ সব জাগতিক কর্ম শরী'আহ্ মেনে সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক এবং তা ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে এসব উদ্দেশ্যের সত্যিকার প্রতিফলন থাকতে হবে। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত কয়েকটি বাক্যে নির্ধারণ করে দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস (আইএআইবি) :

"ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণা বাস্তবায়ন করছে যা অর্থায়ন ও অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্ আইন কঠোরভাবে মান্য করে চলে। অধিকন্তু ব্যাংক এমনভাবে কাজ করবে যেন বাস্তব জীবনে ইসলামী নীতির প্রতিফলন ঘটে। একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে ইসলামী ব্যাংক। মানুষের মনে গভীর ধর্মীয় চেতনা তৈরি করা হবে এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য"।[৯৩]

ইসলামী ব্যাংকিং দর্শনের মূল ভিত্তি হলো আল-কুরআন ও রাসূল (স.)-এর হাদিস এবং এগুলোর মাধ্যমেই তা পরিচালিত হবে আশা করা হয়। ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক আদর্শিক ভিত্তি রচনা করা প্রধানত দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, করপোরেট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা বা নীতিনির্ধারকেরা এই দর্শন অনুসরণ করবেন।

দ্বিতীয়ত, এসব দর্শন একটি নির্দিষ্ট ইসলামী ব্যাংক সত্যিকার ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করছে কি না তার একটি নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে যে ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ করা হলেও ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের অনুমতি প্রদান এবং উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে শর্ত হলো এর সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি ও লাভ একপক্ষীয় না হয়ে ভারসাম্যপূর্ণ হবে। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা একটি ধর্মীয় পদক্ষেপও বটে। এর ফলে শরী'আহ্ বিধিবিধান অনুসরণ করে ব্যাংকিং ব্যবসা করা যায়।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে রিবার বিলোপ ইসলামী ব্যবসার একটি অপরিহার্য অংশ। মুনাফা সর্বোচ্চকরণের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য ঠিক রেখে ইসলামী ব্যবসায়িক নীতির ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে এই ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা ও স্টাফরা বাধ্য। এই নীতিমালার মধ্যে থাকবে

৯৩ আলি, মানজুর, Islamic Banking: Concept and Practice, পাকিস্তান অ্যান্ড গালফ ইকোনমিস্ট, জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ: ১৩।

আল্লাহ নির্দেশিত এবং আল্লাহর রাসূল (স.) প্রদর্শিত সততা, ন্যায়পরতা এবং সাম্য। ব্যবসা পরিচালনা প্রক্রিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং সর্বোচ্চ সামাজিক সুফল হাসিলের জন্য আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলাম জোর দিয়ে বলেছে, আয় হতে হবে বৈধ। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে, ইসলামের দাবি হলো এর অনুসারীরা মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় করবে। অপচয় বা অবৈধ পথে খরচ করবে না। ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে গ্রাহকের সম্পর্ক ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার নয়, এই সম্পর্ক একজন ব্যবসায়িক অংশীদারের। ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শনের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, তাই সমাজের দরিদ্র অংশটির দিকে সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টির জন্য এর একটি বিঘোষিত ঝোঁক (orientation) থাকতে হবে, যাতে ইসলামের আর্থসামাজিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে এই দরিদ্র অংশটির আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কিছু উদ্দেশ্য এবং কাজ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো একই– এমন যুক্তিও দেয়া যেতে পারে। বাহ্যিকভাবে এগুলোর মধ্যে মিল থাকলেও গুরুত্বের ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য অনেক। এই অমিলের উৎপত্তি দুই ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি ভিন্নমুখী অঙ্গীকারে। ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে হিসেবে আর্থসামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক ভ্রাতৃত্ব হলো মুসলমানদের আদর্শ ও বিশ্বাসের একটি অলঙ্ঘনীয় অংশ।

অনুবাদ : মাসুম বিল্লাহ

তথ্যসূত্র :

আবু জাহরা, মুহাম্মদ, বুহুত ফি আল-রিবা, কুয়েত; দার আল-বুহুত আল-ইলমিয়াহ, ১৯৭০।

আহমদ, আবু ওমর ফারুক, Islamic Banking in Bangladesh, অপ্রকাশিত এলএলএম থিসিস; ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনি, অস্ট্রেলিয়া, ২০০৩।

Islamic Banking in Bangladesh: Legal and Regulatory Issues, ইসলামী অর্থায়নবিষয়ক ষষ্ঠ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ফোরামে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র, ৮-৯ মে, ক্যামব্রিজ, এমএ।

Problems of Islamic Banking in Bangladesh, ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকায় উপস্থাপিত গবেষণাপত্র, জনুয়ারি ২১, ২০০১।

Legislations and Issues on Islamic Banking in Bangladesh, মালয়েশিয়ার লংকাভিতে অনুষ্ঠিত তরুণ গবেষকদের জন্য *ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম অন ইসলামিক ইকোনমিকস, ফাইন্যান্স অ্যান্ড বিজনেস*-এ উপস্থাপিত গবেষণাপত্র, ১৮-২০ এপ্রিল, ২০০৬।

আহমদ, আবু ওমর এবং **হাসান, এম কবির**, Regulation and Performance of Islamic Banking in Bangladesh, থান্ডারবার্ড ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস রিভিউ, ৪৯, ২০০৭।

The Time Value of Money Concept in Islamic Finance, আমেরিকান জার্নাল অব ইসলামিক সোস্যাল সায়েন্স, হার্নডন, যুক্তরাষ্ট্র, ২৩, ৬৬-৮৯।

আহমদ আল-বায়হাকী, আল-সুনান আল-কুবরা, হায়দ্রাবাদ, ১৮৫৪।

আহমদ, আউসাফ, The Evaluation of Islamic Banking, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামিক ব্যাংকিং, লন্ডন, ১৯৯৫।

আহমদ, শেখ মাহমুদ, Economics of Islam: A Comparative Study, (দ্বিতীয় সংস্করণ), লাহোরঃ শাহ মুহাম্মদ আশরাফ, ১৯৫৮।

আহমেদ, ওসমান বাবিকির, The Contribution of Islamic Banking to Economic Development: The Case of The Sudan, পিএইচডি গবেষণাপত্র; ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিকস, ইউনিভার্সিটি অব ডারহাম, ১৯৯০।

আল-আফগানী, সাঈদ, Aswaq al-`Arab Fi al-Jahiliyyah Wa al-Islam, বৈরুত; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫।

আলি, মানজুর, Islamic Banking: Concept and Practice, পাকিস্তান অ্যান্ড গালফ ইকোনমিস্ট, জানুয়ারি ১৯৮৫।

আলী, এস.এ, ইকনিমিক ফাউন্ডেশনস অব ইসলাম, লাহোর, ১৯৬৪।

আহমদ, আল-ইমাম, আল-মুসনাদ, 'Bab al-Riba', খণ্ড ২।

আল-দারিমি, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, আল-সুনান, আবদুল্লাহ হাশিম ইয়ামানি আল-মাদানী (সম্পাদিত), ফয়সালাবাদঃ হাদিস অ্যাকাডেমি।

আলী, এ. ইউসুফ, The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, লাহোর; ইসলামিক প্রপাগেশন সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৭৫।

আল-ইসফাহানী, আল-রাঘিব আল-হুসাইন, Al-Mufradat Fi Gharaib al-Qur'an, কায়রো, ১৯৬১।

আল-জাসাস, আহমাদ, Ahkam al- Qur'an, বৈরুত; দার আল-ফিক্‌র।

আল-জাজিরি, আবদাল-রহমান, Kitab al-Fiqh `ala al-Madhahib al-'Arba`ah, বৈরুত।

আল-মাসরী, রফিক ইউনিস, Masrif al-Tanmiyah al-Islami, বৈরুত; মুয়াসসাহ আল-রিসালাহ, ১৯৭৮।

Al-Jami` Fi 'Usul al-Riba, দামেস্ক, দার আল-কালাম, ১৯৯১।

আল-নাসায়ি, সুনান আল-নাসায়ি।

আল-ওমর, ফুয়াদ ও আবদেল হক, মোহাম্মদ, Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges, লন্ডন; জেড বুকস লিঃ, ১৯৯৬।

আল-রাজী, ফাখর আল-দ্বীন, আল-তাফসির আল-কাবির, খণ্ড ৭, তেহরান।

আল-তাবারি, মুহাম্মদ ইবনে জারির, Jami` al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an, খণ্ড ৬, বৈরুত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮০।

আল-তিরমিজী, সুনান আল-তিরমিজী।

আরিফ, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), Monetary and Fiscal Economics of Islam, জেদ্দা; ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিকস, কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, ১৯৮২।

আসাদ, মুহাম্মদ, The Message of the Qur'an, জিব্রালটার; দার আল-আন্দালুস, ১৯৮৪।

বুখারী, কিতাব আল-বুয়ূ', বাব বায়ে আল-দিনার বি আল-দিনার নাসা'ন।

চাপড়া, এম উমর, Towards a Just Monetary System, লিচেস্টার, ১৯৮৬।

আল দিওয়ানী, তারেক, The Problem With Interest, লন্ডন, ১৯৯৭।

হাবিবী, নাদের, The Economic Consequences of the Interest-Free Islamic Banking Systems, পিএইচডি থিসিস; মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৭।

হক, নাদীম উল এবং আব্বাস মিরাখোর, Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment in an Interest Free Economy; মহসিন এস খান এবং আব্বাস মিরাখোর সম্পাদিত Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance বইয়ের লেখা, হিউস্টন, ১৯৮৭।

হক, জিয়া-উল, Islam and Feudalism: The Moral Economics of Usury, Interest and Profit, কুয়ালা লামপুর, ১৯৯৫।

হ্যান্ডবুক অব ইসলামিক ব্যাংকিং, আইএআইবি, জেদ্দা, ১৯৮২, খণ্ড ৫।

হর্নবে, এ. এস., Oxford Advanced Learner's Dictionary, নিউ ইয়র্ক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০।

আতাউল হক সম্পাদিত Readings in Islamic Banking, বইয়ে এম আজিজুল হক-এর "Prohibition of Interest and Some Common Misgivings", ঢাকা, ১৯৮৭।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস (আইএআইবি), Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, জেদ্দা, ২০০১।

ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক, আল-সিরাহ আল-নাবাবিয়াহ, খণ্ড ২, বৈরুত, ১৯৯৬।

ইবনে কাহির, ইসমাইল, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, ১৯৮২, খণ্ড ১।

ইবনে মাজাহ, মুহাম্মদ, আল-সুনান, মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদ আল বাকি সম্পাদিত, Kitab al-Tijarah, খণ্ড ২, কায়রো, ইসা আল-বাবি আল-হালাবি।

ইকবাল, জুবাইন এবং **মিরাখোর, আব্বাস,** Islamic Banking, ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯৮৭।

কাস্টেন, ইনগো, Islam and Financial Intermediation, ওয়াশিংটন ডিসি, আইএমএফ স্টাফ পেপারস, ১৯৮২।

খান, আব্দুল জাব্বার, Divine Banking System, জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, উইন্টার, ১৯৮৪।

হক, নাদীম উল ও আব্বাস মিরাখোর, Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment in an Interest Free Economy এবং

মহসিন এস খান ও আব্বাস মিরাখোর সম্পাদিত Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance বইয়ে খান, মোহসিন, এস. Islamic Interest Free Banking: A Theoretical Analysis, ১৯৮৭।

কেনিফিন, ডব্লিউ.এইচ, How to Use Your Bank, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৭।

মওদূদী, আবুল আ'লা, Towards Understanding the Qur`an, লিচেস্টার; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

মুহাম্মদ আসিম আল-হাদ্দাদ অনূদিত Al-Riba, বৈরুত, দার-আল ফিক্র, ১৯৭০।

মাঙ্গলা, আই ওয়াই এবং **উপ্পল, জে ওয়াই,** Islamic Banking: a Survey and Some Operational Issues, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস-এর গবেষণা, খণ্ড ২, ১৯৯০।

মান্নান, এম এ., Islamic Economics: Theory and Practice, দিল্লি; ইদারা-ই আদাবিয়াত ই দিল্লি, ১৯০৮।

মীয়ানি, আনোয়ার আহমেদ, Islamic Banking – Where Are We Going Wrong?, নিউ হরাইজন, লন্ডন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮।

মুসলেহ উদ্দিন, মোহাম্মদ, Insurance and Islamic Law, নিউ দিল্লি, ১৯৮২।

মুসলিম, কিতাব আল-মুসকাত, বাব বাই আল-তা'ম মিথলান বি মিথলিন।

কিতাব আল-মুসকাত, বাবল আল-সারফ ওয়া বাই আল-ধাহাব বি আল-ওয়ারাক নাকতান।

নিদাউল ইসলাম ম্যাগাজিন, Principles of Islamic Banking, সংখ্যা ১০, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৫।

নূরজোই, এম. সিদ্দিক, Islamic Laws on Riba (Interest) and their Economic Implications, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব মিডিল ইস্ট স্টাডিজ, খণ্ড ১৪, ১৯৮২।

প্রিয়র, ফ্রেডরিক এল., The Islamic Economic System, জার্নাল অব কমপারেটিভ ইকোনমিকস, খণ্ড ১৯, ১৯৮৫।

কাসেম, এম. কাসেম, Islamic Banking, New Opportunities for Cooperation Between Western and Islamic Financial Institutions, বাটারওয়ার্থ সম্পাদিত, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, লন্ডন, ১৯৮৬।

কিউ কুরেশি, আনোয়ার ইকবাল, Islam and the Theory of Interest, লাহোর; শাহ মোহাম্মদ আশরাফ, ১৯৯১।

কুতুব, সাইয়্যিদ, ফি জালালিল কুরআন, বৈরুত, ১৯৯৭।

Tafsir 'Ayat al-Riba, বৈরুত; দার আল-বুহুথ আল-ইলমিয়াহ।

রাহমান, ফজলুর, Riba and Interest, ইসলামিক স্টাডিজ, সংখ্যা ১, মার্চ ১৯৬৪।

Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, শিকাগো; শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২।

সাইয়্যিদ, আবদুল্লাহ, Islamic Banking and the Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, লেইডেন, ১৯৯৬।

সালেহ, নাবিল এ., Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking, ক্যামব্রিজ, ১৯৯২।

স্কচ, জোসেফ, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ১৯৩৯ সংস্করণ।

An Introduction to Islamic Law, অক্সফোর্ড, ১৯৬৪।

সিদ্দিকী, মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ, Banking Without Interest, লিচেস্টার; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭।

সিদ্দিকী, এস. এ., Public Finance in Islam, লাহোর, ১৯৬২।

উলফেল, চার্লেস জে., Encyclopedia of Banking and Finance, শিকাগো, ১৯৯৩।

জারকা, এম. আনাস, Capital Allocation, Efficiency and Growth in an Interest-Free Islamic Econom্, জার্নাল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ১৯৮২।

জিয়াউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত বই Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam-এর নিবন্ধ An Islamic Perspective on the Economics of Discounting in Project Evaluation, ১৯৮৩।

Stability in an Interest-Free Islamic Economy: A Note, পাকিস্তান জার্নাল অব অ্যাপ্লাইড ইকোনমিকস, উইন্টার ১৯৮৩।

ইসলামী ব্যাংকিং

সময়ের অর্থমূল্য ও নিষিদ্ধ 'রিবা'

এরদেম বাফরা[১]

সারমর্ম

যেসব উপাদান ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে, রিবা তার অন্যতম। তবে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সব দিককে এটি ক্ষতিগ্রস্ত করে কি না জানতে রিবা ধারণাটির আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পবিত্র কুরআন যদিও ইসলামী অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা, এসব প্রতিষ্ঠান ও ধারণা নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু পবিত্র কুরআন সাধারণভাবে একটি ইসলামী সমাজের নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং অনৈতিক লেনদেনের নিন্দা জানিয়েছে। ইসলামী আইনের বেশির ভাগ ধারায় (মাযহাব) ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু নীতিমালা আবশ্যিকভাবেই রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কিছু নীতিমালা প্রণয়নের স্বার্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা অত্যন্ত জরুরি। যেমন, টাকা বা অর্থকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা হবে কি না, কোনো অবস্থায় টাকাকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা হবে এবং কী ধরনের লেনদেনে অর্থের সময়মূল্য থাকবে।

১. সূচনা

সাধারণভাবে এ নিবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো, রিবা বা সুদের ধারণা ও তাৎপর্য পরীক্ষা করে দেখা। যেহেতু ইসলামী ব্যাংকিংয়ে রিবা নিষিদ্ধ এবং ইসলামী আইন সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত, তাই আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এর লেনদেনের ব্যাপারেও ইসলামী আইনে কিছু নীতিমালা রয়েছে। অন্য দিকে একটি ইসলামী সমাজে রাষ্ট্র ও শরী'আহ্ পরস্পর থেকে আলাদা নয়, বরং একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এ পরিস্থিতিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সব আইনকানুন ও বিধিবিধান ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, 'রিবা' যেহেতু পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ, কাজেই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্য ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হবে।

মুসলমানরা শরী'আহ্ মেনে চলেন। তাই তারা হালাল নয় এমন কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারেন না এবং তারা সুদ নিতে বা দিতে পারে না। অন্য দিকে গত চার দশকে ইসলামী আর্থিক

১ **ড. এরদেম বাফরা**, তুরস্কের সাবেক বিচারপতি (২০০২-২০০৩); পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ; বর্তমানে দেশটির পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছেন।

প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশাল প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এই খাতে এ রকম একটি প্রশ্ন প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছে যে, 'ইসলামী অর্থব্যবস্থা কিভাবে প্রচলিত বা পশ্চিমা অর্থব্যবস্থার মোকাবেলা করবে?' ইসলামী অর্থব্যবস্থার সুদমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি (perspective) থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লেনদেন প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার লেনদেন পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই নিবন্ধে আমরা মূলত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় 'রিবা' ধারণার তাৎপর্য আলোচনা করবো। তার আগে রিবা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হবে। পরে দেখবো কিভাবে এবং কেন রিবা নিষিদ্ধ, রিবার উপাদানগুলো কী কী, অর্থ বা টাকার সময়মূল্যের বিপরীতে রিবার অবস্থা এবং ইসলামী ব্যাংকিং চুক্তির ভিত্তিগুলো কী।

২. রিবার ধারণা

ইসলামী ব্যাংকিং বিধি অনুযায়ী রিবা হচ্ছে সেসব উপাদানের অন্যতম, যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ পরিপন্থী (কান, ১৯৮৬, আলগউদ ও লুইস ২০০৭, চং ও লিও, ২০০৯; হুসেইন, ২০১১; জামান ২০১১)। রিবা ছাড়াও ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিতে হারাম-হালাল, ঘারার-মাইসির ও জাকাতের ধারণা প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় (আলাগউদ ও লুইস, ২০০৭)। সংক্ষেপে বিষয়টা এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারেঃ ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ খাতে বিনিয়োগ বা লেনদেন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শূকরের মাংস কিংবা মদজাতীয় পানীয় ব্যবসার অনুমতি শরী'আহ্ দেয় না। একইভাবে শরী'আহ্ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এমন কোনো লেনদেনের অনুমতি দেয় না যেখানে ফটকাবাজীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ঘারার (অনিশ্চয়তা)। ঘারার-এর কারণে 'জুয়া' ইসলামে নিষিদ্ধ। এর মানে হলো, সমুদ্র থেকে যে মাছ এখনো ধরা হয়নি, তা বিক্রি করা বৈধ নয়।

'ঘারার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'অনিশ্চয়তার লক্ষণ', 'ঝুঁকি', 'চুক্তিতে ফটকামূলক অবস্থা' (এল গামাল, ২০০৬)। বলা যায়, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য যেহেতু সমাজের কল্যাণসাধন, তাই 'ঘারার' নিবারণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো অনিশ্চিত আর্থিক ঝুঁকি থেকে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের রক্ষা করা। যদিও ঘারার নিয়ে আলোচনা হয় 'এটা অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কি না' সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে আবদুল-রাহমান একে 'প্রবঞ্চনা' বলেই অভিহিত করেছেন (আবদুল-রাহমান, ২০১০)। এ প্রসঙ্গে কিছু বিক্রি চুক্তির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে; যেমন, কোনো পণ্যের দাম নিয়ে যদি অনিশ্চয়তা থাকে, পণ্যটির মালিকানা যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের হাতে না থাকে, পণ্যটি যদি কোনো পক্ষের নিয়ন্ত্রণে না থাকে অথবা পক্ষদ্বয়ের দায় নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে এগুলোকে 'ঘারার' বলা যেতে পারে। অন্য দিকে ইসলামী ব্যাংকিং নীতিতে, একটি ইসলামী সমাজে সম্পদ পুনর্বণ্টনে জাকাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং যেসব দেশে রাষ্ট্র জাকাত সংগ্রহ করে না, সেখানে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে একটি জাকাত তহবিল গঠন করতে হবে (আলগউদ ও লুইস, ২০০৭)।

রিবা আরবি শব্দ। এর আক্ষরিত অর্থ 'অতিরিক্ত', 'প্রবৃদ্ধি' অথবা 'বাড়তি' (মিউস ও ওয়ালস, ২০১১)। অন্য কথায় এর অর্থ, গুণগত বা পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। পবিত্র কুরআনে (৩:১৩০) রিবাকে 'দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী আইনে দুই ধরনের রিবার কথা এসেছে। প্রথমত, রিবা আল-কর্দ বা রিবা আল-নাসিয়াহ এবং দ্বিতীয়ত, রিবা আল-বুয়্যূ (আলগউদ ও লুইস, ২০০৭)। রিবা আল-কর্দ হলো ঋণ দিয়ে সুদ নেয়া। অন্য দিকে রিবা আল-বুয়্যূ হলো মহাজনী বা সুদি কারবার। রিবা আল-বুয়্যূকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটিকে বলা যায় 'রিবা আল ফাদল'। পণ্য বিনিময় বা বিক্রির মাধ্যমে এখানে সুদ লেনদেন হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে 'রিবা আল-নিসা'। এটি একই পণ্যের একই গুণগত মান ও পরিমাণ পণ্য বিনিময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যে বিনিময় একই সময়ে সম্পন্ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে রিবার এসব প্রকারভেদ ইসলামপূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে। কিছু পণ্যকে ইসলামী আইনে 'রিবায়ি' (সুদি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন নগদ অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর ও লবণ। এসব পণ্য কাউকে ঋণ হিসেবে দিয়ে পরে বর্ধিত পরিমাণে আদায় করাই 'সুদি কারবার'। ইসলামপূর্ব যুগে প্রধানত স্বর্ণ, রৌপ্য, লবণ, গম, যব ও খেজুর ওজন করে বিক্রি হতো। সে যুগে ঋণকে বলা হতো রি'সাল-মাল এবং ঋণ দিয়ে আদায় করা অতিরিক্ত অর্থকে বলা হতো রিবা। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রিবা আল-নাসিয়াহ হচ্ছে প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থার ভিত্তি, যা ইসলামী সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. রিবা নিষিদ্ধের উৎস

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে রিবা

রিবা নিষিদ্ধ করার মৌলিক যুক্তি হচ্ছে পবিত্র কুরআনে সব ধরনের সুদের নিন্দা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা আল-বাকারার ২৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি তুমি অনুতপ্ত হও, তবে তুমি তোমার মূলধন পেতে পারো।' ২৭৫ নং আয়াতে আছে, 'আল্লাহ কেনাবেচার অনুমতি দিয়েছেন, আর সুদকে করেছেন নিষিদ্ধ।' আবার, ২৭৬ নং আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সুদের কারবারের প্রতি নাখোশ এবং দানকে করেছেন ফলপ্রদ।' সূরা আল-ইমরানের ১৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ, লোভীর মতো সুদ গিলো না। আল্লাহর প্রতি তোমার যে দায়িত্ব তা পালন করো। তাহলেই হয়তো তুমি সফল হবে' (টেলর, ২০০৩; মিউস ও ওয়ালশ, ২০১১)। এসব আয়াত থেকে আমরা উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, পবিত্র কুরআন সব ধরনের সুদই নিষিদ্ধ করেছে। অবশ্য পবিত্র কুরআনের এই সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কতিপয় পণ্ডিত, যাদের মধ্যে পশ্চিমারাও রয়েছেন, মনে করেন আল-কুরআনে 'ইউজারি' শব্দের মানে হচ্ছে 'সুদের উচ্চ হার' (দারাত ১৯৮৮; রয় ১৯৯১)। তবে বেশির ভাগ আলেম এই অভিমতের সঙ্গে একমত নন। তারা মনে করেন, রিবা বলতে শুধু 'ইউজারি'কে বোঝানো হয়নি, বরং পবিত্র কুরআন সব রকম সুদকেই নিষিদ্ধ করেছে।

হাদিসে রিবা প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআনের মতো মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স.)ও সুদের নিন্দা করেছেন এবং অলসতা ও অসহায়ত্ব পরিহারের শিক্ষা দিয়েছেন (লুইস, ২০১১)। তবু মহানবী (সা.)-এর সুদ নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে রিবা আল ফাদল-এর কথা বলা হয়ে থাকে। বলা হয়, রিবা আল নাসিয়াহ প্রসঙ্গে হাদিসসংখ্যা খুব কম। বেশির ভাগ হাদিস মতে, রিবা হচ্ছে একই ধরনের পণ্যের উপস্থিত বা হাতে হাতে বিনিময়, যা পরিমাণে বিভিন্ন (জামান, ২০১১)। এ প্রসঙ্গে জামান জোর দিয়ে বলেন, পবিত্র কুরআনে রিবা প্রসঙ্গটি এসেছে ঋণের বেলায় এবং হাদিসে বিক্রির বেলায় (জামান, ২০১১)। উদাহরণস্বরূপ, স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য কিংবা খেজুরের বদলে খেজুর উপস্থিত (on the spot) বিনিময় হতে পারে। এই বিনিময়ে যদি কেউ বেশি পায়, তাকে রিবা বলা যাবে। কেউ যদি কাউকে নগদ অর্থ ধার দেয়, তাহলে ঋণদাতা সেই ব্যক্তির কাছ থেকে সমপরিমাণ অর্থই ফেরত নিতে পারবেন। জামান আরো বলেন, কেউ যদি কারো কাছ থেকে কিছু পণ্য ধার নেয়, যা 'হাতে হাতে' বিনিময় হবে না, কিছু দিন পর ফেরত দেবে, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আদায় রিবা আল-নাসিয়াহর অন্তর্ভুক্ত হবে (জামান, ২০১১)।

৪. বিতর্ক : সুদ কিভাবে হয়

সাধারণ দিক

ওপরে বলা হয়েছে, আরবি শব্দ 'রিবা' বলতে সুস্পষ্টভাবে বোঝায় 'অতিরিক্ত', 'বৃদ্ধি' বা 'বাড়তি।' তবে একটি ইসলামী সমাজে রিবা সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে কি না, তা বোঝার জন্য এ ধারণাটি নিয়ে আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামী সমাজে রিবাকে অন্যায় ও শোষণমূলক বলে মনে করা হয়। পবিত্র কুরআনও রিবা নিষিদ্ধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ইসলামী সমাজে রিবাকে দেখা হয় সীমালঙ্ঘন বা পাপ হিসেবে। পবিত্র কুরআনে নিষেধের ফলে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে বাড়তি কিছু বা সুদ নেয়া যায় না। কেবল যে পরিমাণ (অর্থ বা পণ্য) ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছিল, ততটুকুই ফেরত নেয়া যায়। এর অন্যথা আল্লাহর আদেশ অমান্য করার শামিল বলে গণ্য হয়।

পবিত্র কুরআন অর্থনৈতিক পদ্ধতি, ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে না বটে, তবে এতে একটি ইসলামী সমাজের নৈতিক মানদণ্ডটি বলে দেয়া আছে। আরো আছে অন্যায় লেনদেনের নিন্দা। এ ছাড়া ইসলামী আইনের বিভিন্ন ভাবধারায় (School) বেশির ভাগের মতো এই যে, একটি ইসলামী অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে কিছু মৌলনীতিমালা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে (আলগউদ ও লুইস, ২০০৭; জামান ২০১১)। যেমন, রিবা নিষিদ্ধকরণ একটি নীতি, যাকে অবশ্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে। এছাড়াও আরো কিছু সর্বসম্মত নীতিমালা, যেমন– ঝুঁকি-ভাগাভাগি, ফটকাবাজি আচরণ নিষিদ্ধকরণ, চুক্তি প্রণয়নে সততা এবং সব কর্মকাণ্ড যেন ইসলামী আইন-অনুবর্তী হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন ওঠে : 'রিবা নিষিদ্ধকরণের আওতায় কি সব ধরনের সুদই অন্তর্ভুক্ত?' যদিও রিবা দুই ধরনের, কিন্তু আর্থিক লেনদেনের বেলায় রিবা বলতে সুদকেই বুঝায় (দারাত, ১৯৮৮; রয়, ১৯৯১; লুইস ২০১১)। এ অবস্থায় ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে নিজস্ব পন্থা উদ্ভাবন ও অনুসরণ করতে হবে, যা হবে শরী'আহসম্মত এবং এর ভিত্তিতেই সুদমুক্ত পদ্ধতিতে সেবা দিতে হবে।

এ দিকে রয়-এর মতে, আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং কমিউনিটি এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামী (আর্থিক) প্রতিষ্ঠানগুলো আদর্শিক দিক থেকে দুর্নীতিপরায়ণ এবং লোকদেখানো 'ইসলামী' (রয়, ১৯৯১)। তিনি আরো বলেন, ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপকরা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সহযোগিতায় নানা রকম সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার মারপ্যাঁচ খাটিয়ে 'সুদ' নিয়ে থাকেন। বিশেষত আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এটা ঘটে (রয়, ১৯৯১)।

অনেক বিশেষজ্ঞ আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে রিবা ও সুদকে একই রকম ভাবার যুক্তিটি মানতে নারাজ। প্রশ্ন উঠছে, যদি সুদ গ্রহণের ক্ষেত্রে শোষণের লক্ষ্য না থাকে, সে ক্ষেত্রে শরী'আহ্ কি তাকে (সুদ) মেনে নেবে? এর জবাবে বলা যেতে পারে, শোষণের প্রশ্ন না-থাকলে সেই সুদকে গ্রহণযোগ্য বলা যাবে, ইসলাম তা মনে করে না (ফারুক ও হাসান, ২০০৬)। অন্যভাবে বিষয়টি বলা যায়, একটি ঋণ থেকে ঋণদাতা ও গ্রহীতা দু'জনই লাভবান হচ্ছেন এবং গ্রহীতা খুব গরিবও নন। সে ক্ষেত্রে কী হবে? বেশির ভাগ আলেমের মতে, এ রকম সব লেনদেনই রিবা বলে গণ্য হবে এবং তা নিষিদ্ধ।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের এ কথাও বলতে হয় যে, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের পোর্টফলিও বোঝাতে যখন 'ব্যাংক' কথাটি ব্যবহৃত হয়, সেখানে তা প্রধানত ধার্মিকতার ওপরই নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ তুরস্কের 'প্রাইভেট ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন'গুলোর কথা বলা চলে। বহু বছর ধরে এসব প্রতিষ্ঠান ওই দেশে কাজ করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের একাংশের ধারণা, এরা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি সুবিধা পেয়ে আসছে, কিন্তু তাদের যা করার কথা তা করছে না। কাজেই তাদের 'প্রাইভেট ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট' নামটি বদলানো উচিত (ওজকান ও হাজিরোগ্লু, ২০০০; বাত্তাল ২০০৯)। অন্য দিকে এসব প্রতিষ্ঠানের ভাবধারা (concept) অনুযায়ী এগুলোকে 'ব্যাংক'ও বলা যায় না। কিন্তু তুরস্কে তা বলা হচ্ছে, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

যাহোক, একপর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলো নাম বদলে 'পার্টিসিপেশন ব্যাংক' নাম গ্রহণ করে। এসব ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য দু'টি : প্রথমটি তো এর নাম শুনেই পরিষ্কার। দ্বিতীয়টি হলো সুদমুক্ত ব্যাংকিং। এসব ব্যাংকের সব লেনদেন ও কেনাকাটা পর্যালোচনা করে বলা যায়, নতুন ধারণাকে কাজে লাগানোর ফলে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির (Informal economy) মুখে লাগাম পরানো যাবে এবং সুদমুক্ত ব্যাংকিং খাত আরো শক্তিশালী হবে। আমরা দেখেছি, তুরস্কে এসব ব্যাংকের জন্য 'সেভিংস ডিপোজিট বীমা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, যা ব্যাংকগুলোর

বিকাশে সহায়ক হবে। তবে 'ব্যাংক' নাম ব্যবহার করে তুরস্কের এ পদ্ধতি সীমালঙ্ঘন এবং সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার গায়ে কলঙ্কচিহ্ন আঁকছে কি না, তা এ মুহূর্তে বলা কঠিন।

রিবা, সুদি কারবার ও অর্থের সময়মূল্য

এরকম একটি প্রশ্ন সাধারণভাবেই উচ্চারিত হয় যে, সব ধরনের সুদই কি রিবা? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'ইউজারি' (সুদি কারবার) বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন (মিউস ও ওয়ালস, ২০১১; লুইস ২০০৭)। ইসলাম যদিও 'রিবা' ও 'ইউজারি' শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তবু বলা হয় যে, 'ইউজারি' থেকে কিভাবে 'রিবা' এলো, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ইউজারি (Usury) কথাটির শাব্দিক অর্থ 'সুদের শর্তে টাকা ধার দেয়ার চর্চা'। এ ছাড়া টাকা ধার দিয়ে 'চড়া' ও 'অবৈধ' পরিমাণ সুদ নেয়াও বুঝায় (জামান, ২০১১)। এখানে প্রশ্ন আসে, 'চড়া সুদ বলতে কী বুঝায়?' জেরেমি বেনথামের মতে, ইউজারি অর্থ হচ্ছে 'আইনে নির্ধারিত হারের চেয়ে কিংবা প্রচলিত হারের চেয়ে বেশি সুদ গ্রহণ' (মিউস ও ওয়ালস, ২০১১)। এ প্রসঙ্গে আমরা উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের কথা বলতে পারি। একটি জাতির সম্পদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি কিছু নৈতিক যুক্তি তুলে ধরেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে ইউজারি নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি ইউজারি নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি নাগরিকদের ঋণদানে শোষণমূলক চড়া সুদ আদায় এবং এ ক্ষেত্রে কোনো রকম ফটকাবাজি প্রশ্রয় না দিতেও বলেছেন (মিউস ও ওয়ালস, ২০১১)। অ্যাডাম স্মিথের নৈতিকতাসম্পর্কিত বক্তব্য ব্যাখ্যা করে হল্যান্ডার বলেছেন, তার (অ্যাডাম) এই বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে রিবা ও ঘারার। হল্যান্ডারও প্রকৃত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির স্বার্থে ইউজারি নিষিদ্ধ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পবিত্র কুরআনের মতো হিব্রু বাইবেলেও ইউজারি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটা অন্যায় লেনদেন (লুইস, ২০০৭)। এ ক্ষেত্রে ইসলামের মতো খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা বিষয়টিকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেনি এবং তারা অর্থায়ন প্রশ্নে কোনো নৈতিক বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি, কিন্তু দ্বাদশ শতকে এসে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরাও বলতে শুরু করে, ইউজারি হচ্ছে চুরি। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি এসে আইনজীবীরা ইউজারি এড়িয়ে লেনদেন বিষয়ে চুক্তি করা শুরু করেন। অবশ্য তখনও কিছু সন্দেহজনক ব্যাপার যে ঘটেনি তা নয়। এ অবস্থায় খ্রিষ্টধর্মের শীর্ষ আইনজীবীরা যেকোনো আর্থিক কর্মকাণ্ডের আইনি বৈধতা নিশ্চিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ইউজারি নিষেধাজ্ঞার বিভিন্ন আইন চালুর পাশাপাশি বহু সংস্কারক জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাতে থাকেন যেন ইউজারি বা চড়া সুদের ব্যবসা থেকে তারা দূরে থাকে। এই শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ইউজারি নিষিদ্ধ করে আইন পাস হয়। আইনে সুদহারের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়, যা পর্যায়ক্রমে পাঁচ শতাংশে নেমে আসে।

লুইস দেখিয়েছেন, ইউজারি প্রশ্নে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য হবেন না, যতক্ষণ না তিনি স্বীকার করেন যে, যিশু (হজরত ঈসা আ.) আল্লাহর প্রেরিত নবী। আল্লাহর প্রেরিত সব নবী-রাসূল ও ইসলাম এমন কিছু মতবাদ ও নীতিমালা দিয়েছে, যা আল্লাহ ও সমাজের সঙ্গে একজন মুসলমানের সম্পর্ক নির্ধারণ করে (লুইস, ২০০৭)। লুইস আরো মনে করেন, ইসলাম কেবল একটি ধর্মমাত্র নয়, বরং এটি একটি জীবনবিধান, যা মানবজাতির আত্মিক ও বাস্তব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খল করে।

ঋণদানকার্যক্রমে অর্থের সময়মূল্য নিয়ে আলোচনার আগে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে 'অর্থের ধারণা'টি (Concept of money) পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা যেসব কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, অর্থ কি মূলধন নাকি নয়; কী অবস্থায় এটি মূলধন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং কোন ধরনের লেনদেনে অর্থের সময়মূল্য থাকবে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই যে, একটি প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় অর্থ যদিও ব্যবসার একটি প্রধান উপাদান, তা সত্ত্বেও এটি এমন কোনো পণ্য নয়, যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে এবং এমনও নয় যে, বেহিসাবী অপব্যয় করা যাবে (আনোয়ার, ২০০৩; ফারুক ও হাসান, ২০০৬)। মুসলমানদের কাছে অর্থ হচ্ছে কোনো পণ্য বা সেবা কেনার একটি উপাদান মাত্র। তবে অর্থকে অর্থ উপার্জন বা মুনাফা লাভের জন্য 'খাটানো' যাবে না। 'অর্থ'-বিষয়ক ধারণার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এই দুই রকম অভিমত থেকেই প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের মূল পার্থক্যরেখাটি আঁকা হয়েছে (কান, ১৯৯১; ফারুক ও হাসান, ২০০৬)।

এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান এ রকম : যদি কেউ তার নগদ অর্থ অন্যকে ধার দেয়ার কাজে ব্যবহার করে, তবে তা মূলধন বলে গণ্য হবে না। তবে যদি ওই অর্থ কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করে কিংবা পণ্য কেনার কাজে লাগায়, তবে তা মূলধন বলে গণ্য হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, শরী'আহ্ মতে, পণ্য কেনায় ব্যবহৃত কিংবা ব্যবসায় বিনিয়োগ করা অর্থ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর একটা সময়মূল্য থাকবে; অন্যথায় অর্থের কোনো সময়মূল্য থাকবে না। এ ছাড়া দু'টি কারণে ইসলামে অর্থ ও ভোগ্যপণ্যকে আলাদা করে দেখা হয় (ফারুক ও হাসান, ২০০৬)। প্রথমত, অর্থ দিয়ে পণ্য কেনা যায়, অর্থ ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করা যায়। কাজেই, এটি ব্যবসার বিষয়বস্তু (Subject matter) নয়। দ্বিতীয়ত, অর্থের ব্যবসা নিষিদ্ধ। যদি কাউকে অর্থ ধার দেয়া হয়, সমপরিমাণ অর্থেই ফেরত নেয়া যাবে। মুনাফা লাভের জন্য কেউ অর্থ ধার দিতে পারবে না।

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, অর্থের সময়মূল্য যেকোনো অর্থব্যবস্থার একটি মৌলিক উপাদান। এই যুক্তির আক্ষরিক অর্থ হলো 'কিছু সময়ের জন্য অর্থ ব্যবহারের জন্য একটা ভাড়া।' ইসলামী সমাজের বিশ্বাস হলো, সম্পদমূল্যে ঋণপ্রবৃদ্ধি নিষিদ্ধ নয়, তবে অর্থের বিনিময়ে অর্থ আদায় নিষিদ্ধ (ফারুক ও হাসান, ২০০৬)। সোজা কথায়, আগে অর্থ ধার দিয়ে পরে অর্থ ব্যবহারের সময়ের ওপর গ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায় করা ইসলাম সমর্থন করে না। তবে এই

সময়মূল্য পণ্য কেনাবেচার ক্ষেত্রে বৈধ। এ ছাড়া মূল্য পরে কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে– এমন ক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে পণ্যটির বর্ধিত মূল্য নির্ধারণ যদিও বৈধ, কিন্তু অর্থের সময়মূল্য পূর্বনির্ধারিত মূল্য বলে গণ্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রদত্ত ঋণ বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু শরী'আহ্ অনুযায়ী তা হালাল হবে না। এখানে একটি প্রশ্ন এসে পড়ে : ইসলামী অর্থব্যবস্থার সুদমুক্ত পদ্ধতিতে এটা কি একটা মডেল (Model)?

যেহেতু শরী'আহ্ সব ধরনের সুদকেই নিষিদ্ধ করেছে, কাজেই ঋণ দিয়ে অর্থের সময়মূল্য আদায় করাও রিবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। শরী'আহ্ কেবল 'কর্জে হাসানা'র অনুমতি দেয়, যা কিনা সুদবিহীন। ইসলামী সামজে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এ ধরনের ঋণ লেনদেন খুবই সাধারণ ঘটনা। এ ছাড়া শরী'আহ্ অনুমোদিত আরেকটি ঋণপদ্ধতি হচ্ছে 'ওয়াদিয়াহ।' এটি বিনিময়যোগ্য পণ্যের সাময়িক ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (আরবাউনা, ২০০৭)।

রিবা নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি চুক্তিকারী পক্ষগুলোকে চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলার ওপরও জোর তাগিদ দিয়েছে পবিত্র কুরআন (২:২৭৫-৭৯)। এতে স্পষ্ট যে, আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন কোনো দেনাদারের ঋণচুক্তি অমান্য করাকে পবিত্র কুরআন নিন্দা করেছে। অপর দিকে পবিত্র কুরআন কর্জকে সেবা বলে গণ্য করে এবং এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, অর্থের সময়মূল্য হচ্ছে রিবা এবং এর (রিবা) মাধ্যমে কর্জ বা ঋণদানের মানবিক দিকটি উপেক্ষিত হয়। তাই রিবা লেনদেন নিষিদ্ধ। অবশ্য আলেমদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মনে করেন, পণ্য কেনার ক্ষেত্রে যেহেতু পূর্বনির্ধারিত মূল্য অর্থাৎ সময়মূল্য বৈধ, সে কারণে অর্থ ঋণের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে বেশির ভাগ আলেমই এ মতকে সঠিক মনে করেন না (খান, ১৯৯১: ফারুক ও হাসান, ২০০৬)।

৫. ইসলামী ব্যাংকিং চুক্তির ভিত্তি

ইসলামী সমাজে রাষ্ট্র ও শরী'আহ্ পরস্পর আলাদা নয় বরং এখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি দিকই ইসলামের বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত। কাজেই মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যও ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে, এটাই প্রত্যাশিত। অন্য কথায়, মুসলমানদেরকে জুয়া খেলা, মদপান ও শূকরের মাংস খাওয়ার মতো সবরকম হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। রিবা এগুলোর মতোই একটি হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ। কাজেই আর্থিক লেনদেনও হতে হবে হালাল উপায়ে। এসব যুক্তি একটি ইসলামী অর্থায়ন পরিবেশের দাবি করে এবং বিশেষজ্ঞরা কিছু ইসলামভিত্তিক এমন কিছু আর্থিক উপকরণের (financial instrument) উদ্ভব ঘটাতে আগ্রহী হয়েছেন, যা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ বা হালাল।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লেনদেন চুক্তিগুলোকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : ভোক্তাভিত্তিক (Consumer based) ও করপোরেটভিত্তিক (Corporate based)। এ ছাড়া আরো অনেক ধরনের চুক্তি করা হয়। তবে একটি আদর্শ ইসলামী ব্যাংকের চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রধান হলো লাভ-

ক্ষতি ভাগাভাগি (profit and loss sharing) চুক্তি। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বহুল ব্যবহৃত চুক্তিগুলো একটি ছকে দেখানো হলো (ছক-১):

ছক-১ : সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইসলামী ব্যাংকিং চুক্তির ধরন

ভোক্তাভিত্তিক	পণ্যের নাম	ব্যবহৃত পদ্ধতি
জমা	চলতি হিসাব সঞ্চয়ী হিসাব স্টাফ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট	ওয়াদিয়াহ মুদারাবা কর্জে হাসানা
ক্রেডিট	ক্রেডিট কার্ড	তাওয়াররুখ (কস্ট প্লাস কনট্রাক্ট
অর্থায়ন	হাউস ফিন্যান্সিং	বাই বিথামান আযিল (বিবিএ) (বিলম্বে মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে বিক্রি) মুসায়ারাখ মুতানাকিয়াশ (Diminishing Partnership)
	ব্যক্তিক অর্থায়ন (Individual firancing	মুরাবাহা (Cost Plus)
	ভেহিকল ফিন্যান্সিং	বাই বিথামান আজিল (বিলম্বে মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে বিক্রি)
	স্টাফ ফিন্যান্সিং	কর্জে হাসানা
করপোরেটভিত্তিক	পণ্যের নাম	ব্যবহৃত পদ্ধতি
	ট্রেড ফিন্যান্সিং	ওয়াকালাহ মুদারাবা মুরাবাহা (Cost Plus)
	অ্যাসেট ব্যাকড ফিন্যান্সিং	ইজারা (ফিন্যান্সিয়াল লিজিং)
	করপোরেট বিনিয়োগ	বাই বিথামান আযিল ইজারা ইসতিসনা মুরাবাহা মুদারাবা মুশারাকা (লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি)

সূত্র : অ্যারিস, ওসমান, আযলি, শাহরি, আবদুল রাজাক ও আবদুল রহমান, ২০১৩

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, ইসলামী বিশেষজ্ঞরা সাধারণভাবে একমত যে, সব রকম সুদই রিবা বলে গণ্য হবে। কাজেই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে হতে হবে সুদমুক্ত (আনোয়ার, ২০০৩; আরবুনা, ২০০৭; সিদ্দিকী, ২০০৮)। অবশ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নও

উঠেছে যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ আইন প্রযোজ্য কি না।[২] যেমন, বেক্সিমকো বনাম শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন মামলা। এতে বিচারপতি বলেন, এখানে শরী'আহ্ আইনের মতো কোনো পদ্ধতি বেছে নেয়ার বিধান নেই। কাজেই আপিল আদালত আপিলটি খারিজ করে দেয়।

বাস্তবে কিন্তু 'সব রকম সুদই রিবা'-এ ধারণা গ্রহণ করা সহজ নয়। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত স্মর্তব্য। ১৯৯১ সালে দেশটির ফেডারেল শরী'আহ্ কোর্ট এক বৈপ্লবিক (radical) রায়ে বলে, 'মূলধনের যেকোনো ধরনের প্রবৃদ্ধি, এমনকি মুরাবাহা, রিবা বলে গণ্য হবে।' এই রায়ের ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার দেশের ব্যাংকিং খাতের প্রতি আবেদন জানায় যেন তারা কেবল লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। ইসলামী ব্যাংকিং প্রবর্তনে ব্যর্থতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাকিস্তান (কান, ২০০৬; কান; ২০০৮; আলম, আর্সলান, সালিম, রাজিক ও আলিম, ২০১১)। শরী'আহ্ কোর্টের ওই রায় মানতে অস্বীকার করেন দেশটির ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। তারা আপিল আদালতে গেলে ১৯৯৯ সালে আপিল আদালত ফেডারেল আদালতের রায়টি খারিজ করে দেয়। ফলে পাকিস্তানে ইসলামী ও প্রচলিত দুই ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থাই বহাল থাকে (কান, ২০০৬; কান ২০০৮; আলম, আর্সলান, সালিম, রাজিক ও আলিম, ২০১১)।

এ কথা সত্য যে প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি হচ্ছে লাভ-ক্ষতির বণ্টনবিষয়ক। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলে আছে এটি। যেকোনো ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিই সুদবিহীন লাভ-ক্ষতি বণ্টনব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যবস্থার দু'টি ধরন রয়েছে– 'মুশারাকা' ও 'মুদারাবা' (আনোয়ার, ২০03, আরবুনা, ২০০৭, সিদ্দিকী, ২০০৮)। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বেশির ভাগ তাত্ত্বিক মডেল এই দু'টি ধরনকে ভিত্তি করে গঠিত হয়। নিচে সংক্ষেপে এগুলোর নিয়ে আলোচনা করা হলো।

মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যাংক ও অপরপক্ষ (উদ্যোক্তা) একটি মূলধন গঠন করেন এবং এর ঝুঁকি ও লভ্যাংশ দুটোই ভাগাভাগি করে নেন। সাধারণভাবে বলা যায়, এটি হচ্ছে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি ব্যবসা। অপর দিকে, মুদারাবা পদ্ধতিতে পুরো মূলধন জোগান দেবে ব্যাংক এবং কেবল পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে মুনাফা বণ্টিত হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংককে লোকসানের দায়ও আনুপাতিক হারে নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে সাধারণত উদ্যোক্তার শ্রম, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনাই তার দিক থেকে প্রদত্ত মূলধন বলে বিবেচিত হয়।

---

২ আপিল আদালতের সিদ্ধান্তটি ছিল বিচারপতি মরিসনের দেয়া একটি রায়ের ভিত্তিতে। আপিলটি করা হয়েছিল শামিল ব্যাংক অব বাহরাইনের কিছু অর্থায়ন চুক্তি ও গ্যারান্টির বিষয়ে। অন্য দিকে আইনে বলা ছিল, এই চুক্তি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হবে ইংল্যান্ডের আইনের ভিত্তিতে।

ছক-২ : প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে প্রধান পার্থক্য

	প্রচলিত ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
কর্মপদ্ধতি	মানবরচিত নীতিমালার ভিত্তিতে	শরী'আহ্র ভিত্তিতে
বিনিয়োগকারীর আস্থা	পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ	মুনাফার হারের ভিত্তিতে
লক্ষ্য	লাগামহীন মুনাফা	শরী'আহ্র বিধিনিষেধ মান্য করে
হিসাবে নিয়ম	পণ্যের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দ্বারা চালিত	চুক্তি অনুযায়ী
মৌলিক কার্যক্রম	চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে ধার প্রদান	অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় অংশগ্রহণ। ক্লায়েন্টের ব্যবসা সম্বন্ধে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।
সম্পর্ক	ঋণদাতা ও গ্রহীতা	যেমন হতে পারে : বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়িক অংশীদার, ক্রেতা ও বিক্রেতা
জমার হার ও গ্যারান্টি	সুদের হার নির্ধারিত এবং আমানতের পূর্ণ নিশ্চয়তা	হিবাহ হিসেবে মুনাফার নিশ্চয়তা নেই এবং মুনাফার হার অবশ্যই অনুমিত। কেবল ওয়াদিয়াহ আমানতের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।
ঋণ/অর্থায়নের হার	সাধারণত ভাসমান হারের ওপর নির্ভরশীল, বিএলআর+/−হার	- ফিক্সড প্রফিট মার্ক আপ - মুনাফার হার ভাসমান

সূত্র : অ্যারিস, ওসমান, আযলি, শাহরি, আবদুল রাজাক ও আবদুল রহমান, ২০১৩ : ১১৪৯

ওপরের ছক থেকে আমরা দেখি, ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি হলো শরী'আহ্ নীতিমালা এবং তাতে অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হয় মানবরচিত বিধিবিধান অনুযায়ী এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। শরী'আহ্ রিবা নিষিদ্ধ করায় ইসলামী ব্যাংকগুলোতে সব কার্যক্রম সুদমুক্তভাবে সম্পন্ন হয়। তবে ইসলামী আইনের 'চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা' এখানে পূর্ণরূপে বজায় থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে ইবনে কাইয়িম মনে করেন, রিবা বা ঘারারের মতো কোনো ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকলে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে সম্পাদিত অনন্য বা ব্যতিক্রমী (sui generis) চুক্তিগুলোকে বৈধ বলে গণ্য করা উচিত (আরবুনা, ২০০৭)। যেমন : কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য কিংবা কিছু দিনারের বিনিময়ে কিছু আমেরিকান ডলার বিক্রি করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে লেনদেনটা কিস্তিতেও হতে পারে।

আমরা বলতে পারি, প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকে নির্বাহীর সংখ্যা অনেক বেশি। এ ছাড়া বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, অংশীদার, ক্রেতা ও বিক্রেতারা ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি ও লেনদেন করছে। এর ভিত্তিতে আমরা উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুশারাকা ও মুদারাবা চুক্তি যদিও খুব সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু এই খাতে বিপুলসংখ্যক কর্মী এবং 'চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা' আছে, সেটাই ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্য নবতর অর্থায়ন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন সমাধান এতে দিতে পারে।

৬. উপসংহার

পবিত্র কুরআন যেহেতু রিবা নিষিদ্ধ করেছে, তাই ইসলামী সমাজে রিবা বা সুদ লেনদেনকে পাপকাজ হিসেবে দেখা হয়। তবে পবিত্র কুরআন কোনো সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এর ধারণা (Concept) নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু তা না করলেও একটি ইসলামী সমাজের নৈতিক মানদণ্ডটি পবিত্র কুরআনে নির্ধারণ করে দেয়া আছে। এতে সব রকম অবৈধ লেনদেনের নিন্দা করা হয়েছে। আলেমসমাজ রিবাকে সুদের একটা রূপ মনে করলেও তাদের ছোট একটি অংশ তা মনে করে না। আমাদের আলোচনার লক্ষ্য এটা স্থির করা যে, যদি সুদ লেনদেনে শোষণমূলক লক্ষ্য না থাকে, সে ক্ষেত্রে শরী'আহ্‌র নিয়মকানুন মেনে তা নেয়া বা দেয়া যাবে কি না।

এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যদি কেউ তার টাকা অন্যকে ধার দেয়ার কাজে ব্যবহার করে তবে তা মূলধন বলে গণ্য হবে না। তবে ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে বা কোনো পণ্য কিনলে, ইসলামী বিধানমতে তাকে মূলধন বলা যাবে। সে ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ব্যবসায় বিনিয়োগ বা পণ্য কেনার ক্ষেত্রে অর্থকে মূলধন বলা যাবে এবং তখন তার সময়মূল্যও থাকবে, অন্যথায় নয়।

সবচেয়ে অনুকূল একটি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সুদমুক্ত লেনদেন নিয়ে বাদানুবাদ পরিহারের লক্ষ্যে উপসংহারে আমরা কিছু অভিমত পেশ করছি :

১. যেহেতু সুদ নিষিদ্ধ, তাই খেলাপি ঋণের জন্য কোনো সুদ ইসলামী ব্যাংক দাবি করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি এড়াতে একটা বিকল্প ব্যবস্থা দরকার। যেমন : বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব হলে তার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে, আগেভাগে ঠিক করা প্রয়োজন। বিপরীতে কোনো গ্রাহক যদি নির্ধারিত সময়ের আগেই দেনা পরিশোধ করেন, তাকে কী পরিমাণ ছাড় (Discount) দেয়া হবে, তাও আগেই ঠিক করতে হবে।

২. 'রিবা' বলতে কী বোঝানো হবে, প্রত্যেক দেশকে তার নিজস্ব আইনে তার ব্যাখ্যা রাখতে হবে। ইসলামী ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেমন, মুরাবাহা চুক্তি, বীমা ও ওয়ারেন্টি কন্ডিশন প্রকাশ করতে হবে।

৩. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন বিশেষত লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি ও মুরাবাহা চুক্তি যেহেতু প্রধানত ধার্মিকতার ওপর নির্ভর করে, তাই নৈতিকতা সম্পর্কিত কোনো ঝামেলা থাকলে তা মিটিয়ে ফেলতে হবে। ক্রেডিট রেটিং ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিকূল তথ্যাবলি কমিয়ে আনতে হবে।

৪. ইসলামী ব্যাংক আসলে কী, এই ধারণা সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেন সমাজ বুঝতে পারে যে, 'ব্যাংক' মানে সবসময় 'সুদভিত্তিক ব্যাংক' নয়।

৫. প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং তারল্যসঙ্কট নিরসনের স্বার্থে ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের সুদহার অনুসরণ করলেও 'লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি' পদ্ধতিকে এগিয়ে নিতে হবে। প্রচলিত ব্যাংকের ইউনিট থাকলেও ইসলামী ব্যাংককে আলাদাভাবে ইসলামী অর্থায়ন সেবা চালিয়ে যেতে হবে।

৬. ইসলামী ব্যাংকগুলোর আইন বিভাগকে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং 'চুক্তির স্বাধীনতা' নীতিমালার আওতায় নতুন নতুন চুক্তির ধরন সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে প্রচলিত ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংককে আরো সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন যেহেতু সাধারণভাবে লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগিভিত্তিক, তাই বিনিয়োগে বিধিনিষেধ থাকলে তা তুলে নিতে হবে।

অনুবাদ : হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী

তথ্যসূত্র

আবদুল-রাহমান, ওয়াই., (২০১০); The Art of Islamic Banking and Finance, নিউজ জার্সি : জন ওয়েলি অ্যান্ড সন্স, ইনক্।

আলম, এইচ.এম. / আর্সালান এম. / সালিম এম. / রাজিক ই. এবং আলিম এ., (২০১১); Development of Islamic Banking in Pakistan, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব কনটেমপরারি রিসার্চ ইন বিজনেস, ৩ (১), ২৬১।

হাসান এম. কে. এবং লুইস এম. কে. (সম্পাদিত) Handbook of Islamic Banking বইয়ে আলাগউদ, এল. এম. এবং লুইস, কে.এম., (২০০৭)-এর নিবন্ধ, Islamic Critique of Conventional Financing, ৩৪।

আনোয়ার, এম, (২০০৩); Islamicity of Banking and the Modes of Islamic Banking, এরাব ল কোয়ার্টারলি, ১৮ (১), ৬২।

আরবুনা, বি.এম. (২০০৭); The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance, থান্ডারবার্ড আইবিআর, ৪৯ (৩), ৩৪১।

আরিস, এন.এ. / ওসমান, আর. / আজলি, আর.এম. / শাহরি, এম. / আবদুল রাজাক, ডি এবং আবদুল রাহমান জেড.

(২০১৩); Islamic Banking Products: Regulations, Issues and Challenges, দি জার্নাল অব অ্যাপ্লাইড বিজনেস রিসার্চ, ২৯ (৪), ১১৪৫।

বাত্তাল, এ., (২০০৯); Katılım Bankacılığında Kırmızı Çizgiler; Kalkıyor mu? Kalkmalı mı? [Red Lines in Participation Banking; Cancelling? Should be Cancelled?], অ্যাকটিভ ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স জার্নাল, ৬২, ৬।

চুং, বি.এস. এবং **লিউ, এম-এইচ**, (২০০৯); Islamic Banking: Interest Free or Interest Based?, প্যাসিফিক-বাসিন ফিন্যান্স জার্নাল, ১৭, ১২৫।

দাররাত, এফ.এ., (১৯৮৮); The Islamic Interest-Free Banking System: Some Empirical Evidence, অ্যাপ্লাইড ইকোনমিকস, ২০, ৪২৭।

এল গামাল, এম.এ., (২০০৬); Islamic Finance: Law, Economics and Practice, নিউ ইয়র্ক, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ফারুক, ইউ.এ. এবং **হাসান কে.এম.** (২০০৬); The Time Value of Money Concept in Islamic Finance, দি আমেরিকান জার্নাল অব আইএসএস, ২৩ (১), ৬৬।

হুসেইন, এস., (২০১১); Islamic Banking: A Study of Relevant Operating Modes in Current Financial Scenario, রিসার্চ জার্নাল অব ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং, ২ (৭/৮), ১।

খান, এফ. এম., (২০০৮); Islamic Banking by Judiciary: The 'backdoor' for Islamism in Pakistan, জার্নাল অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, ৬৩৫।

খান, এফ. এম., (১৯৯১); The Value of Money and Discounting in Islamic Perspective, রিভিউজ অব ইসলামিক ইকোনমিকস, ১ (২), ৩৫।

খান, এম. এম., (২০০৬); Main Features of Interest-Free Banking Movement in Pakistan, ম্যানেজারিয়াল ফিন্যান্স, ৩৯ (৯), ৬৬১।

খান, এস. এম. (১৯৮৬); Islamic Interest Free Banking, স্টাফ পেপারস-আইএমএফ, ১।

মোহাম্মদ আরিফ ও মনোয়ার ইকবাল সম্পাদিত The Foundations of Islamic Banking Theory, Practice and Education, পৃষ্ঠা ৩৯, লুইস, কে.এম. (২০১১এ); Ethical Principles in Islamic Business and Banking Transactions।

এম কবির হাসান ও মেরভিন কে. লুইস সম্পাদিত Handbook of Islamic Banking, ৬৪ পৃষ্ঠা, লুইস, কে.এম., (২০০৭বি); Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury।

মোহাম্মদ আরিফ ও মনোয়ার ইকবাল সম্পাদিত The Foundations of Islamic Banking Theory, Practice and Education, পৃষ্ঠা ২১১, মিউস, সি. এবং ওয়ালস এ., (২০১১); Usury and its Critics; From the Middle Ages to Modernity।

ওজকান, এম.ই. এবং **হাজিরুগ্লু টি.**, (২০০০); Bankacılıkta Yeni Bir Boyut: Katılım Bankacılığı [A New Dimension in Banking: Participation Banking], Albaraka Türk Bereket Dergisi [Albaraka Türk Bereket Journal], ৯, ৮.।

রয়, এ.ডি. (১৯৯১); Islamic Banking, মিডিল ইস্টার্ন স্টাডিজ, ২৭ (৩), ৪২৭।

সিদ্দিকী, এম., (২০০৮); Islamic Banking, দি মিডিল ইস্ট, নভেম্বর, ৩৫।

টেলর, এম. জে. (২০০৩); Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in the United States, আমেরিকান বিএলজে, ৪০, ৩৮৫।

মোহাম্মদ আরিফ ও মনোয়ার ইকবাল সম্পাদিত The Foundations of Islamic Banking Theory, Practice and Education, পৃষ্ঠা ২২২, জামান, আর., (২০১১); Riba and Interest in Islamic Banking: An Historical Review।

ইসলামী ও প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থা
তুলনামূলক আলোচনা

আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব[১]

সারমর্ম

সাম্প্রতিক কালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্যোগ অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থার সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। এই নিবন্ধে সার্বিকভাবে ইসলামী অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা নিজেকে কিছুটা তুলে ধরতে সক্ষম হলেও এ ব্যাপারে অতি রঞ্জনের কিছু নেই। ইসলামী অর্থায়ন শরী‘আহ্ মেনে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানের আওতায় পরিচালিত হয়। যতই লাভজনক হোক না কেন শরী‘আহ্সম্মত নয় এমন কোনো তৎপরতা যেমন : মদ, শূকরজাতীয় প্রাণী ও পর্ণোগ্রাফির মতো ব্যবসায় কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করতে পারে না। বিভিন্ন গবেষণার ভিত্তিতে এই নিবন্ধ রচনায় গুণগত পদ্ধতি (qualitative method) অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা ও প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থার মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তা এই নিবন্ধের সার্বিক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে।

১. সূচনা

বিগত চার দশকে ইসলামী ব্যাংকগুলো সংখ্যা ও আকারে বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। এই ব্যবস্থার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। কিছু দেশ (যেমন : সুদান, ইরান ও পাকিস্তান) তাদের পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরে সফল হয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থার আধিপত্য রয়েছে এমন অনেক দেশে (যেমন– মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র) প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং উইনডো পরিচালনা করছে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে মিশরে মিট-ঘামার নামে একটি এবং করাচি শহরে আরেকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু। এই দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির ফল স্বরূপ ১৯৭৫ সালে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

---

১ **আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব** ইউনির্ভাসিটি সাইন্স ইসলাম মালয়েশিয়া'র একজন গবেষক। এই নিবন্ধ রচনায় তাকে আরো সহায়তা করেছেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাম্মদ রিদওয়া আবদুল আজিজ, ওমর আলী আবু জরাইদা, আলী মাহমুদ আল সানুসি, আবদাল রাহমান হামুদ আল হিনাই এবং আবদুর রহিম ইব্রাহিম।

হয় দুবাই ইসলামিক ব্যাংক। ১৯৯৬ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের ৩৪টি মুসলিম এবং অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৬টি। ১৯৭০-এর দশকে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির গতি লক্ষণীয় (চাপড়া, ২০০১)। বর্তমান বিশ্বে ৬০টির বেশি দেশে ছয় শতাধিক ইসলামী ব্যাংক কাজ করছে এবং বিভিন্ন ধরনের ইসলামী অর্থায়ন পণ্য ও সেবা দিয়ে যাচ্ছে (রাজেশ এবং অন্যান্য, ২০০০)। এসব ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত তহবিল প্রায় এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (দার, ২০০৩)। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৮%-এর বেশি। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (আইএফআই), পেশাদার ব্যাংকার ও বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জোরালো স্বীকৃতি মিলছে। সন্দেহ নেই ইসলামী ব্যাংক সফলতার সঙ্গে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যাংকের পাশাপাশি নিজের কার্যক্রমে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। বলতে গেলে বর্তমান বিশ্বে আর্থিক, ব্যাংকিং এবং সংশ্লিষ্ট লেনদেনে ইসলামী নীতি, বিধি ও ঐতিহ্য অনুসরণকে উৎসাহিত করা এবং তা এগিয়ে নিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো কাজ করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচও বটে (তাহির, ২০০৩)।

প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নের সুবিধা পরিব্যাপ্ত : এটা প্রকৃত খাতের (real sector) সঙ্গে মিল রেখে আর্থিক খাতকে সুরক্ষিত রাখে, এটা জুয়া ও ফটকাবাজি এড়িয়ে চলে এবং এর ভিত্তি ব্যাপক ও সার্বজনীন। প্রথম দুটি বৈশিষ্ট্য একে অধিকতর স্থিতিশীলতা দিয়েছে এবং তৃতীয়টি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নকে প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় করেছে অধিক উপযোগী। তা ছাড়া, প্রচলিত ব্যবস্থা উন্নত ও পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ রয়েছে (সিদ্দিকী, ২০০০)।

ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। এর সবেচেয়ে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ঋণ সৃষ্টির জন্য সরাসরি অর্থ বা অন্যান্য সম্পদ ধার দেয়া বা নেয়ার অনুমতি নেই। ইজারাভিত্তিক অর্থায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তব সম্পদ বিক্রি বা ইজারা দেয়ার ফলে ঋণ সৃষ্টি হলে কেবল তখনই এর অনুমতি রয়েছে। ঋণ কেনাবেচা বা অন্যকারো কাছে স্থানান্তর করা যায় না এবং ইজারা দেয়া বা বিক্রি করা সম্পদ হতে হবে বাস্তব (যেমন– ভবন, সম্পত্তি বা অন্য কোনো ভৌত অবকাঠামো) (কিয়ং এবং অন্যান্য, ২০১০)। ইসলামী অর্থায়নের ভিত্তি হলো শরী'আহ্ বা ইসলামী আইন। এর মূল চেতনা হচ্ছে আর্থিক লেনদেনকে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। এই শর্তাবলি অতিমাত্রায় ঝুঁকি গ্রহণের আশঙ্কা কমিয়ে দেয়। ইসলামী অর্থায়ন মুনাফা ও ঝুঁকি ভাগাভাগির ওপর গুরুত্ব দেয়। এর ফলে ঝুঁকি অনুপাতে মুনাফাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। তাই, ইসলামী অর্থায়নের নির্ভরযোগ্যতা ও শক্তির সম্ভাবনাটি দৃশ্যত আর্থিক লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত বাস্তব বিনিয়োগ তৎপরতার ফল।

২. সংক্ষেপে ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা

ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা ইসলামী আইনসম্মত (শরী'আহ্) আর্থিক পণ্য জোগান দেয়। মূলত মুসলিম বিনিয়োগকারীরা এর গ্রাহক এবং কিছু ইসলামী পণ্য প্রচলিত ব্যবস্থার বিনিয়োগকারী ও বিনিয়োগগ্রহণকারীকেও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে (হোসেইন এবং অন্যরা, ২০১১)। প্রচলিত ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল বলে মনে করা হয়। কারণ, এটি মূলত ঋণ ও সুদের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত এবং তা ক্রেডিট মাল্টিপ্লায়ার (credit multiplier) ও অন্যান্য পন্থায় অন্যায্য ঋণ সৃষ্টি করে। তবে, প্রচলিত ঋণ-অর্থায়ন ব্যবস্থার আগে ইকুইটি অর্থায়ন ব্যবস্থা সুপরিচিত ছিল। এরপরও বেশ কিছু কার্যকারণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে ঝুঁকি-বণ্টনমূলক চুক্তির বদলে ঋণভিত্তিক চুক্তি আধিপত্য বিস্তার করে। এসব কার্যকারণের মধ্যে ছিল সরকারি ডিপোজিট ইন্সুরেন্স স্কিম, অর্থায়ন চুক্তির আইন ও বিধি এবং করব্যবস্থা। ঋণভিত্তিক ব্যবস্থার আওতায় ঝুঁকি-স্থানান্তরকে উৎসাহিত এবং ঝুঁকি-বণ্টনের সুফলকে উপেক্ষা করা হয়। তাই, কোনো দেশের উন্নয়নে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকিতে অংশীদারিত্ব অত্যন্ত জরুরি এবং বেশির ভাগ দেশে একে একটি অধিকতর পরিমিত আন্তর্জাতিক অনুশীলন হিসেবে গণ্য করা হয় (হোসেইন এবং অন্যরা, ২০১১)।

মূলত, ইসলামী অর্থায়ন হলো ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং ঋণ অর্থায়ন (সুদ) নিষিদ্ধের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত একটি অর্থায়নব্যবস্থা। ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা (proposition) হলো, এমন যেকোনো লেনদেন বেআইনি ঘোষণা যা কোনো ঋণের জন্য ওই ঋণসম্পদের ওপর মালিকানার দাবি স্থানান্তর ছাড়াই সুনির্দিষ্ট মেয়াদে আনুপাতিক হারে লাভ সৃষ্টি করে এবং চুক্তির জন্য ঝুঁকির পুরো দায় অবাধে ঋণগ্রহীতার ওপর চাপিয়ে দেয়। তাই পারস্পরিক বিনিময়কে ঋণভিত্তিক অর্থায়নের একরকম বিকল্প হিসেবে দেখা হয়, যা সম্পদের ওপর অধিকার বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে, উভয় পক্ষকে উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণনের ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নিতে হয়। এতে বিনিময়ের সুফল বেড়ে যায় ও ভোগ হয় সুষম। যা ঝুঁকি ভাগাভাগির মূল ভিত্তি এবং তা জড়িত পক্ষগুলোকে আয়-অস্থিরতার ঝুঁকি দূর করার সুযোগ এনে দেয় (হোসেইন এবং অন্যরা, ২০১১)।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার শেকড় ইসলামী নীতিমালার মধ্যে গভীরভাবে প্রথিত। এখানে সব কার্যক্রম পরিচালিত হয় কঠোর নৈতিকতার ভিত্তিতে। তাই বলা যায়, ইসলামী আর্থিক লেনদেন হলো নৈতিক বিনিয়োগ (ethical investment)। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নীতি দুটি : লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব এবং ইউজারি তথা সুদ লেনদেন নিষিদ্ধ। ইসলামী পরিভাষায় সুদকে 'রিবা' বলা হয়। ইসলামী আইনে সাধারণভাবে আয় বণ্টনমূলক ব্যবস্থার অনুমতি রয়েছে। অন্য দিকে সুদ লেনদেনের অনুমতি নেই। সব লেনদেন, বিশেষ করে যেখানে অর্থ লেনদেন নিয়ে বিরোধের বিষয় জড়িত, সেখানে ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ এবং এর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত। তবে, ইসলামী ব্যাংকিংকে কেবল রিবার

মূলোৎপাটনের কাজে সীমাবদ্ধ রাখা ন্যায্য হবে না। যেকোনো অর্থনৈতিক লেনদেনে সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউজারি (রিবা), বিভিন্ন ধরনের ঘারার (ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা) এবং কিমার (ফটকাবাজি)। তাই আর্থিক লেনদেনের দূষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর বিলুপ্তি ঘটানোই ইসলামী ব্যাংকিং-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য (মইন, ২০০৮)।

সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এই বিশ্বাসের ওপর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দর্শন প্রতিষ্ঠিত এবং এই ব্যাংক কিভাবে পরিচালিত হবে ইসলামী শিক্ষা তার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়। সুতরাং, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সব অ্যাকাডেমিক প্রচেষ্টা একটি মৌলিক আদর্শকে সামনে রেখে প্রবাহিত। আর তা হলো সুদ নিষিদ্ধ এবং ব্যবসা ও মুনাফা সুরক্ষিত। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা তার সবধরনের আর্থিক লেনদেনে সুদভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে থাকে।

আল্লাহ বলেছেন : "যে সুদ তোমরা (অন্যকে) দিয়ে থাকো, (এই প্রত্যাশায় যে) যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না। আর যে যাকাত (সাদাকাহ্, দান ইত্যাদি) তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।" সূরা আর-রূম (৩০:৩৯)

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে :

"তাদের সুদ গ্রহণ করার জন্য যা গ্রহণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আমি এমন অনেক পাক-পবিত্র জিনিস তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল। আর তাদের মধ্য থেকে যারা কাফের তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।" সূরা আন-নিসা (৪:১৬১)

তাই, ইসলামী আইনের মৌলিক নীতি হলো ঝুঁকি ও ফটকাবাজি নিহিত এমন কোনো শোষণমূলক ও অন্যায্য চুক্তির অনুমতি না দেয়া। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আওতায় আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সব অংশীদারকে অবশ্যই ব্যবসার ঝুঁকি ও লাভ-ক্ষতির ভাগিদার হতে হবে এবং মুনাফা পূর্বনির্ধারণের সুযোগ নেই। ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূল পার্থক্য হলো বিনিয়োগ ও মুনাফার মধ্যে প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সম্পর্ক। এই চেতনা প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে একেবারেই ভিন্ন। প্রচলিত ব্যবস্থায় মূল লক্ষ্য থাকে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বোচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া (দার ও প্রিসলি, ২০০০)।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো।" সূরা আল-বাকারা (২:২৭৮)

"কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এখনো তাওবা করে নাও (এবং সুদ ছেড়ে দাও)

তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।” সূরা আল-বাকারা (২:২৭৯)

অন্য দিকে, এর মানে এই নয় যে মূল অঙ্কের ওপর যেকোনো ধরনের লাভ (gain) ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামে মুনাফা পুঁজির প্রতিদান (reward) হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামী শরী'আহ্ মেনে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যবসায় যদি এই পুঁজি খাটানো হয় তবে এর মালিকের জন্য প্রতিদান দাবি করা ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ। আবার, লাভ বা প্রতিদান কেবল তখনই দাবি করা যেতে পারে যখন ঝুঁকি বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে বা শ্রম ব্যয় করা হয়।

৩. প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মধ্যে পার্থক্য

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এমন এক পরিবেশে কাজ করছে যেখানে প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যাংকগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই, ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে কিন্তু এর সবই আল্লাহর দেয়া বিধিবিধান মেনে। এর মানে হলো, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দর্শন ও কার্যক্রম পদ্ধতি ভিন্ন। এই নিবন্ধে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপরীতে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো কী ধরনের পণ্য ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমানতকারীদের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে অর্থনীতিকে সুচারুভাবে চলতে সহায়তা করাই যেকোনো অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে তহবিল স্থানান্তর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা, পরামর্শক সেবা, মূল্যবান সম্পদ নিরাপদে গচ্ছিত রাখা এবং অন্যান্য সেবা প্রদান। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এসব সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি।

৩.১ আমানত (Deposit)

ইসলামী বা প্রচলিত যেকোনো ব্যবস্থায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে প্রণোদনার (incentive)বিনিময়ে আমানত (deposit) সংগ্রহ করে। যদিও উভয়ের প্রতিদান (reward) প্রদানের চুক্তির শর্তে রয়েছে পার্থক্য। প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রতিদান পূর্বনির্ধারিত এবং স্থির। অন্য দিকে, ইসলামী ব্যবস্থায় মুশারাকা বা মুদারাবা নীতি মেনে আমানত সংগ্রহ করা হয় এবং এখানে প্রতিদান পরিবর্তনশীল। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ে দীর্ঘমেয়াদি আমানত উচ্চতর মুনাফা (return) এবং স্বল্পমেয়াদি আমানত স্বল্পহারে মুনাফা সৃষ্টি করে। অনুশীলনের দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে তেমন কোনো ভিন্নতা নেই। কারণ, এখানেও মুনাফা আমানতকারীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়া হয়। মুনাফা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রাপনীয় (available) দীর্ঘমেয়াদি আমানত উচ্চতর ভার (higher weight) বহন করে। কারণ দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প

থেকে অধিকতর মুনাফা অর্জিত হয়। স্বল্পমেয়াদি আমানত স্বল্প ভার (lower weight) বহন করে, কারণ এমন আমানত দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায় না।

প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার একমাত্র পার্থক্যটি ঝুঁকি ও প্রতিদান (মুনাফা) ভাগাভাগির মধ্যে নিহিত। প্রচলিত ব্যবস্থায় ব্যাংক পুরো ঝুঁকি বহন করে এবং স্থির হারে আমানতকারীদের প্রদানের পর সে পুরো মুনাফার মালিক হয়। অন্য দিকে, ইসলামী ব্যবস্থায় আমানতকারী ও ব্যাংক উভয়েই ঝুঁকি ও মুনাফার অংশীদার হয়। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ ফলাফলের সঙ্গে আমানতকারীদের প্রতিদান (মুনাফা) যুক্ত (হানিফ, ২০১১)।

৩.২ অর্থায়ন ও বিনিয়োগ

ইসলামী ও প্রচলিত অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান উভয়েই উৎপাদনশীল চ্যানেল সৃষ্টি করে মুনাফার জন্য ব্যবসা এবং শিল্পে ঋণসুবিধা দেয়। পার্থক্য সৃষ্টি করে কেবল অর্থায়ন চুক্তি। প্রচলিত ব্যাংকগুলো গ্রাহকদেরকে স্থির মুনাফার বিনিময়ে ঋণদানের প্রস্তাব দেয়। অন্য দিকে, ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো শরী'আহ্য় নিষেধাজ্ঞার কারণে সুদের বিনিময়ে ঋণের প্রস্তাব দিতে পারে না। ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ থেকে লাভ করতে পারলেও ঋণের ওপর সুদ ধার্য করতে পারে না। প্রচলিত ব্যবস্থা তার গ্রাহককে তিন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে: স্বল্পমেয়াদি ঋণ, ওভার ড্রাফট এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। অন্য দিকে, ইসলামী ব্যাংক কেবল সুদবিহীন ঋণ (কর্জে হাসানা) দিতে পারে। অন্য দিকে, এই প্রতিষ্ঠান গ্রাহককে প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবসা করতে পারে (হানিফ)।

৩.৩ ওভারড্রাফট/ক্রেডিট কার্ড

প্রচলিত ব্যাংকগুলো সুদের বিনিময়ে গ্রাহককে তার হিসাব থেকে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের (overdrawing) সুবিধা দেয়। যা গ্রাহকের জন্য নির্ধারিত 'ওভারড্রইং' সুবিধার আওতায় ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও হতে পারে। তাই ক্রেডিট কার্ডধারী গ্রাহকেরা অর্থায়ন ও প্লাস্টিক মানির মতো দ্বৈত সুবিধা ভোগ করেন। এর ফলে গ্রাহক নগদ অর্থ বহন ছাড়াই সহজে তার আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। তবে ইসলামী ব্যাংক কেবল মুরাবাহা পদ্ধতিতে গ্রাহক তাঁর কাঙ্ক্ষিত পণ্য সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু নগদ অর্থ দিতে পারে না।

যদিও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটা করা বা প্রয়োজন পূরণের সুবিধা দেয় ইসলামী ব্যাংক। একজন গ্রাহক তার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট ব্যালান্স (credit balance) থাকা পর্যন্ত এ কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একজন গ্রাহককে পণ্য কেনাকাটার সুবিধা দেয়া হলে সে জন্য সুদ চার্য করা হয়। অন্য দিকে, মুরাবাহা ব্যবস্থায় গ্রাহককে পণ্যটি সরবরাহের পর ব্যাংক কেবল বিক্রির লাভ পাওনা হয়। প্রচলিত ব্যবস্থায়, গ্রাহক যদি খেলাপি

হয়ে পড়েন তবে বাড়তি সময়ের জন্য তাকে বাড়তি সুদ গুনতে হয়। অন্য দিকে, মুরাবাহা ব্যবস্থায় অতিরিক্ত চার্য আরোপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আবার, প্রচলিত ব্যবস্থায় বর্ধিত সময়ের জন্য সুদ প্রদানের ব্যাপারে গ্রাহকের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করা যায়। মুরাবাহা ব্যবস্থায় এটা পুরোপুরি ভিন্ন। কারণ, ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল চুক্তির শুরুতে উভয় পক্ষের সম্মত মূল অর্থ পাওনা হিসেবে দাবি করতে পারে। তবে, মুরাবাহা চুক্তির আওতায় ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ খেলাপি হলে তিনি ভবিষ্যতে যেন এমন আর কোনো অর্থায়ন সুবিধা না পান সে জন্য ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান (আইএফআই)-এর কালো তালিকাভুক্ত হবেন। এ ছাড়া, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (আইএফআই) চুক্তিপত্রে উল্লেখ করে দেবে যে খেলাপির ঘটনা ঘটলে সব কিস্তি একই সঙ্গে ব্যাংকের পাওনা হয়ে যাবে এবং এ জন্য জরিমানা করা হতে পারে। তবে ওই জরিমানার অর্থ আইএফআইর আয় হিসেবে গণ্য হবে না, তা দাতব্য কাজে ব্যয় হবে (উসমানী, ২০০২)।

৩.৪ স্বল্পমেয়াদি ঋণ

প্রচলিত ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের চলতি মূলধনের (working capital) প্রয়োজন মেটাতে স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। যেকোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইনভেনটরি ও প্রাপ্য হিসাব (accounts receivable)-এর পেছনে বিনিয়োগ এবং ব্যয় মেটানোর জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসার দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর জন্য মেয়াদি সার্টিফিকেট (term certificate)-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইনভেনটরি বিনিয়োগ সরবরাহ করে। এখানে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইএফআই আনুপাতিক হারে লাভের অংশীদার হয়।

অন্য দিকে, আইএফআইর লেনদেনে ঝুঁকি থাকায় এর মেয়াদি সার্টিফিকেট-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থায়ন যতটা সহজ, প্রচলিত ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি ঋণ ততটা সহজ নয়। তাই, যেসব প্রতিষ্ঠান আইএফআই থেকে স্বল্পমেয়াদি সুবিধা নিতে চায় সেগুলোকে বিনিয়োগকারীর সন্তুষ্টি আদায়ের মতো ব্যবসায়িক সম্ভবপরতা (feasibility) প্রমাণ করতে হয়। আজ পর্যন্ত কোন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধন প্রয়োজন পূরণে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা এগিয়ে আসেনি। ফলে আইএফআই কোনো ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্যে ঋণ (personal consumption loan) দেয় না।

তবে আর্থিকভাবে সচ্ছল কোনো ব্যক্তি মুরাবাহা অর্থায়নকে তার কাঙ্ক্ষিত কোনো পণ্য লাভের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আইএফআই ওই জিনিসের মূল্যের ওপর লাভ যোগ করে তা সরবরাহ করতে পারে (হানিফ, ২০১১)।

ব্যবসা/অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে মুরাবাহা অর্থায়ন একটি কার্যকর হাতিয়ার। কারণ এটি একটি সম্পদভিত্তিক অর্থায়ন।

আইএফআই যে কাউকে মূল্যায়নের মাধ্যমে বিশেষ করে হালাল (বৈধ) কোনো উদ্দেশ্যে অর্থায়ন করতে পারে। কিন্তু এগুলো সুদের ভিত্তিতে নগদ অর্থ ধার দিতে পারে না। তবে কর্জে হাসানা (হিতৈষী ঋণ) দিতে পারে।

৩.৫. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ

কোনো প্রতিষ্ঠানকে তার সম্প্রসারণ বা বর্তমান সম্পদ পরিবর্তনের জন্য, স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়া হয়। ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করা হয় 'মুরাবাহা' (ইন্টারমেডিয়েশন; গ্রাহকের প্রয়োজনীয় পণ্যটি কিনে তা উচ্চতর মূল্যে গ্রাহকের কাছে বিক্রি), 'বাই মুয়াজ্জাল' (বাকিতে বিক্রি), 'সালাম' ও 'ইসতিসনা' বা আগাম বিক্রি চুক্তি (ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হবে এমন কোনো পণ্যের জন্য ব্যাংক তহবিল জোগান দেয়, ওই নির্দিষ্ট দিনে পণ্যের মূল্য কী হবে তা আগাম নির্ধারণ করা হয়) পদ্ধতি অনুসরণ করে। তা নাহলে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের বেলায় অর্থায়নের বিকল্প হলো 'মুশারাকা' ও 'মুদারাবা'র মতো মুনাফা ভাগাভাগি পদ্ধতি। মুদারাবা, বাই মুয়াজ্জাল ও ইসতিসনা'কে প্রচলিত ধারার ঋণদান পদ্ধতি বলে মনে হলেও চুক্তির শর্তাবলিতে এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। দুই পদ্ধতিতে ঝুঁকি ও মুনাফার ধরনেও রয়েছে পার্থক্য। আইএফআই এবং বিনিয়োগগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মুশারাকা (অংশীদারি) এবং মুদারাবা (মধ্যস্থতা) বেশ চ্যালেঞ্জিং। কারণ বিনিয়োগ হারানোর ঝুঁকি থাকায় আইএফআইর শরী'আহ্‌ভিত্তিক অর্থায়ন প্রকল্পের আওতায় কোনো প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ পেতে চাইলে তাকে ব্যবসার সম্ভবপরতা ও লাভজনকতা (feasibility and profitability) প্রমাণ করতে হয়।

৩.৬ ইজারা (Leasing)

ইজারা হলো অর্থায়নের তুলনামূলক আধুনিক উৎস। এর মাধ্যমে সম্মত ভাড়ার শর্তে কোনো সম্পদের উজুফরাক্ত ইজারাদারের কাছে স্থানান্তরিত হয়। তবে ইজারা সম্পদের মালিকানা স্থানান্তরিত হতে পারে, আবার না-ও পারে। ইজারা চুক্তির আওতায় আইএফআই একই ধরনের সুবিধা প্রস্তাব করতে পারে।

ইজারার আওতায় গ্রাহককে সম্মত ভাড়ার বিনিময়ে মালিকানা হস্তান্তর না করে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনো সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। তবে ইজারা মেয়াদ শেষে ওই সম্পদের মালিকানা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গ্রাহককে হস্তান্তর করা যায়। ইজারা মেয়াদে সম্পদের মালিকানাসংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আইএফআই বহন করে।

ইসলামী এবং প্রচলিত ব্যবস্থায় ইজারা লেনদেনের ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, ইজারা সম্পদের সরবরাহ না পাওয়া পর্যন্ত ইজারাদার ভাড়া পরিশোধের উপযুক্ত হন না। দ্বিতীয়ত,

খেলাপি হলে অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করা যায় না। মূল ইজারা চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে জরিমানা করা যায়। তবে তা আইএফআইর আয় হিসেবে গণ্য হবে না। তৃতীয়ত, ইজারা সম্পদে বড় ধরনের কোনো সংস্কার করা হলে ওই সময়ের জন্য আইএফআই ভাড়া দাবি করতে পারে না। চতুর্থত, ইজারা সম্পদের মালিকানা ঝুঁকি বহন করে আইএফআই। তাই সম্পদটি হারিয়ে গেলে বা ধ্বংস হলে এ জন্য আইএফআই বাড়তি কোনো কিস্তি দাবি করতে পারে না।

৩.৭ কৃষিঋণ

কৃষিঋণ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দুই ধরনেরই হতে পারে। কৃষকদের স্বল্পমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন হয় বীজ ও সার কেনার জন্য। অন্য দিকে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রয়োজন হয় জমি বাড়ানো কিংবা যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য। সাধারণত, কৃষক ফসল তোলার পর তা বিক্রি করে এ ঋণের অর্থ পরিশোধ করে। এ খাতে প্রচলিত ব্যাংকগুলো সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। আইএফআই কৃষকদের একই সুবিধা দেয়, তবে বাই সালাম, বাই মুদারাবা মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে। কৃষকদের বীজ ও সার কেনার জন্য বাই সালাম পদ্ধতিতে নগদ অর্থ দেয়া হলেও তা ঋণ হিসেবে নয়। তা দেয়া হয় কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনে নেয়ার বিনিময়ে, যা ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হবে। যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আইএফআই মুরাবাহা সুবিধা দিলেও মুশারাকা ও মুদারাবা সুবিধা দেয়া হয় বাড়তি জমি উন্নয়নের জন্য। এ ধরনের লেনদেনে ঝুঁকি থাকায় কৃষককে জমি উন্নয়নের ঋণ পেতে হলে উদ্যোগটি যে লাভজনক সে বিষয়ে আইএফআইকে সন্তুষ্ট করতে হয়।

৩.৮ গৃহনির্মাণে অর্থায়ন

ইসলামী ও প্রচলিত উভয় ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলোর জন্য গৃহনির্মাণে অর্থায়ন/বন্ধকী হলো আরেকটি সুরক্ষিত ধরনের অর্থায়ন। প্রচলিত ব্যবস্থায় সুদের বিনিময়ে ঋণ দেয়া হয়। অন্য দিকে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় ঋণ সুবিধা দেয়া হয় ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক ও আইএফআই যৌথভাবে বাড়ি কেনে। পরে আইএফআই তার অংশ একটি সম্মত ভাড়ার বিনিময়ে গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়। অর্থায়নকারীর অংশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা হয়। এতে বাড়ি কেনায় আইএফআইর অংশ এবং এর জন্য ভাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। গ্রাহক কিস্তিতে আইএফআইর পাওনা পরিশোধ করে। প্রতি কিস্তি পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিতে গ্রাহকের অংশ বৃদ্ধি পায় এবং আইএফআইর অংশ কমতে থাকে। পরিশেষে, শেষ কিস্তি পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে আইএফআইর অংশ হয় শূন্য এবং সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের নামে স্থানান্তরিত হয় (হানিফ, ২০১১)।

৩.৯ বিনিয়োগ

তারল্য বজায় রাখার জন্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর অনেক সুযোগ রয়েছে, যেমন– সরকারি সিকিউরিটি, স্বল্পমেয়াদি ঋণ ও কলমানি, লিজিং কোম্পানির বন্ড এবং শেয়ার। প্রচলিত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলক গচ্ছিত রিজার্ভের জন্য সুদ পায়। পাশাপাশি তারা তাদের সম্ভাব্য পাওনার (receivables) বিপরীতে বন্ড ইস্যু করে তারল্য সংগ্রহ করতে পারে। দুর্দিনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সুরক্ষা দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের বিনিময়ে তারল্য জোগান দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য আরেকটি সুরক্ষা হলো আন্তঃব্যাংক আমানত (interbank deposits)। অন্য দিকে, প্রয়োজনীয় তারল্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আইএফআইর সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এগুলো কেবল স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ এবং লিকুইড সিকিউরিটি থেকে কিছু রাজস্ব আয় করতে পারে। আইএফআই সরকারি সিকিউরিটি, স্বল্পমেয়াদি ঋণ, বণ্ড ও কলমানিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ, এর সবগুলোই সুদি ব্যবসা।

ইসলামী ব্যাংকগুলোকেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলক রিজার্ভ রাখতে হয়, কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় এটা তাদের জন্য লাভজনক নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদ নেয় বিধায় দুর্দিনে তারল্য বজায় রাখার জন্য এর দ্বারস্থ হতে পারে না আইএফআই। তারা আন্তঃব্যাংক আমানতের সুদও দাবি করতে পারে না। আইএফআই ইচ্ছেমতো যেকোনো ইকুইটি সিকিউরিটিতেও বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ তার বিনিয়োগের ক্ষেত্র হতে হবে হালাল বা শরী‘আহ্সম্মত। তাই প্রচলিত ব্যাংকিং ও ব্যবসার যে আধিপত্য চলছে তাতে খুব কমসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার উভয় শর্ত পরিপূরণে সক্ষম হয় (হানিফ, ২০১১)।

আইএফআইগুলো তাদের তারল্যের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি উপায় বের করেছে। আর তা হলো, সুকুক (ইসলামী বন্ড)। এখানে মুনাফা (servicing) প্রচলিত ব্যাংকের মতোই নির্ধারিত হলেও এ ধরনের সুকুক ইস্যু করা হয় ইজারা সম্পদের সম্ভাব্য পাওনার বিপরীতে। ইজারা সুকুক-এর আওতায় গ্রাহককে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনো সম্পদের ভাড়া পরিশোধ করা হয়, কিন্তু ওই সম্পদের মালিকানা থাকে আইএফআইর। তারল্যের প্রয়োজন মেটাতে আইএফআই বিনিয়োগকারীদের কাছে সম্পদের সমমূল্যের ‘সুকুক’ বিক্রি করে। এতে সম্পদের মালিকানা সুকুকধারীদের কাছে স্থানান্তর হয়। মুরাবাহা সুকুক বিক্রি করা যায় না। আবার, মুশারাকা সুকুক সেকেন্ডারি মার্কেটে কেনাবেচা করা গেলেও তা কোনো স্থির আয় বহন করে না। যে পোর্টফোলিওর বিপরীতে সুকুক ইস্যু করা হয় তাতে তরল সম্পদের আধিপত্য থাকবে– এই নীতির ভিত্তিতে সুকুক ইস্যু করা হয়। ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় সুকুক হলো মালিকানার সনদ, এটা সাধারণ কোনো ঋণ সিকিউরিটি নয়। তাই সব ঝুঁকি ও লাভের অংশীদার হবেন সুকুকধারীরা।

৪. প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যাংককের বৈশিষ্ট্য

প্রচলিত ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
১. প্রচলিত ব্যাংকের রীতি ও কার্যপদ্ধতি পুরোপুরি মানবরচিত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত।	১. ইসলামী ব্যাংকের রীতি ও কার্যপদ্ধতি ইসলামী শরী'আহ্ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত।
২. বিনিয়োগকারীর জন্য পূর্বনির্ধারিত হারে সুদপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত।	২. ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান পুঁজি সরবরাহকারী (বিনিয়োগকারী) এবং পুঁজি ব্যবহারকারীর (উদ্যোক্তা) মধ্যে ঝুঁকি ভাগাভাগির ওপর জোর দেয়।
৩. এর লক্ষ্য কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ।	৩. এখানে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্য থাকলেও তা শরী'আহ্ আরোপিত সীমানার মধ্যে থেকে।
৪. এই ব্যবস্থায় জাকাতভিত্তিক কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হয় না।	৪. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাকাত নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এমনকি আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জাকাত সংগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে এবং এগুলো নিজেদের জাকাতও পরিশোধ করে।
৫. প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মূল কাজ হলো ঋণ দেয়া এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসহ তা ফেরত পাওয়া।	৫. ইসলামী ব্যাংকগুলোর মূল কাজ হলো অংশগ্রহণমূলক অংশীদারিত্বের ব্যবসা।
৬. খেলাপি হলে এখানে শাস্তি হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপ করা হয়।	৬. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় খেলাপিদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিধান নেই। তবে, দাতব্য কাজের জন্য সামান্য পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আয় করা যেতে পারে। ব্যাংকের লেনদেন আগাম মিটিয়ে ফেলার জন্য রিবেট (rebate) দেয়া যেতে পারে।
৭. অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাওনা সুদ প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, এখানে ইকুইটির সঙ্গে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার কোনো প্রচেষ্টা নেই।	৭. জনস্বার্থের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। ইকুইটির সঙ্গে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য।
৮. সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য অর্থবাজার থেকে ঋণ নেয়া অনেক সহজ।	৮. ইসলামী ব্যাংকগুলো কেবল শরী'আহ্ অনুমোদিত ধার লেনদেনের ওপর গুরুত্ব দেয়।

৯. স্থির আয় আগেভাগে নির্ধারিত হওয়ায় এখানে প্রকল্প মূল্যায়নে কম গুরুত্ব দেয়া হয়।	৯. ইসলামী ব্যাংক প্রকল্প মূল্যায়নের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। কারণ এই প্রতিষ্ঠান লাভ-লোকসানের অংশীদার।
১০. গ্রাহকের ঋণ পরিশোধ যোগ্যতাকে প্রচলিত ব্যাংকগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।	১০. অন্য দিকে, ইসলামী ব্যাংকগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় প্রকল্পের সম্ভবপরতাকে (feasibility)।
১১. গ্রাহকের সঙ্গে একটি প্রচলিত ব্যাংকের সম্পর্ক হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার।	১১. গ্রাহকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক হলো অংশীদার ও বিনিয়োগকারী এবং বণিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার।
১২. প্রতিটি আমানতের (deposit) জন্য প্রচলিত ব্যাংককে গ্যারান্টি দিতে হয়।	১২. ইসলামী ব্যাংক শুধু আল-ওয়াদিয়াহ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত আমানত হিসাবের গ্যারান্টি দেয়। এখানে আমানতকারীরা তাদের তহবিল ফেরত পাবার গ্যারান্টি পান। কিন্তু, হিসাবটি মুদারাবা নীতিভিত্তিক হলে গ্রাহককে লোকসানের অংশীদার হতে হবে।

৫. প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ওপর রচনাদি পর্যালোচনা

সিরাইরি (২০১০) ১৯৯৯ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর ৭১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্টক্যাস্টিক ফ্রন্টিয়ার অ্যাপ্রোচ (stochastic frontier approach)-এর প্রশংসা করেন। বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর দক্ষতা তুলনার ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন করা হয়। এই জরিপে দেখা যায়, উপসাগরীয় অঞ্চলের ব্যাংকগুলো বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি আস্থা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। দেখা যায়, প্রচলিত ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকগুলোর চেয়ে বেশি দক্ষ। কলিম এবং ইসা (২০০৩) বিকল্প অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের আমানতের বিপরীতে মুনাফাপ্রাপ্তির মূল্যায়ন করেন। তারা একটি আমানতের মুনাফার ওপর আরেকটি আমানতের মুনাফা কী প্রভাব ফেলে তা-ও খতিয়ে দেখেন। তারা দেখান, মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

ইব্রাহিম (২০০০) বলেন, মুসলমানরা এই বিশ্বকে দুই দৃষ্টিতে বিচার করেন (ইহকালীন ও পরকালীন জীবন)। অন্য দিকে, পশ্চিমা সেকুলার ভাবধারার অনুসারীরা একে বিচার করেন শুধু বস্তুগত দৃষ্টিতে। ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রচলিত অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু হওয়ায় তা ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। গবেষকদের মতে, প্রচলিত অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম পশ্চিমা মূল্যবোধের বাহক এবং তা মুনাফা অর্জনের বস্তুগত বাস্তবতা ধারণ করে। অন্য দিকে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তি হলো সামাজিক কল্যাণ, সুবিচার ও সমতা।

সুদের হার পরিবর্তনের ফলে ইসলামী ব্যাংকের মুনাফায় কী প্রভাব পড়ে এবং ইসলামী ও প্রচলিত ধারার ব্যাংকের আমানতের ওপর কী ধরনের ইল্ডিং ইফেক্ট (yielding effects) সৃষ্টি হয় তা দেখিয়েছেন জয়নুল ও কাসিম (২০১০)। তাদের গবেষণায় দেখা যায়, মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তারা আরো দেখান যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সুদ-হারের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তারা উল্লেখ করেন, সুদের হার বেড়ে গেলে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে আমানতের হার বাড়িয়ে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে হবে। হানিফ (২০১১) ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে মিল এবং অমিল নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দেখেন, ইসলামী ব্যাংকগুলো শরী'আহ্ বিধিবিধানের মধ্যে থেকেই আধুনিক প্রচলিত ব্যাংকিং-এর মতো কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই গবেষক উল্লেখ করেন, ইসলামী ব্যাংকিংকে প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের নিতান্তই একটি নকল (copy) বললে ভুল হবে। প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যপ্রণালীতে বিস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে।

সামাদ (২০০৪) ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এক দশকে বাহরাইনের সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ও সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনামূলক দক্ষতা খতিয়ে দেখেন। তিনি দুই ধারার ব্যাংকের ক্রেডিট পারফরম্যান্সের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করতে বাধ্য হন। যদিও তার গবেষণায় ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর লাভজনকতা ও তারল্য সামর্থ্যের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

হ্যারন এবং আহমদ (২০০০) অনুমান করেন, ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের ওপর যদি প্রচলিত তত্ত্বের কোনো প্রভাব পড়ে তাহলে প্রচলিত ব্যাংক আমানতের ওপর সুদের হারের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংক আমানতের মুনাফা হারের একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। মালয়েশিয়ার ব্যাংকগুলোতে অ্যাডাপটিভ এক্সপেকটেশন মডেল (adaptive expectation model) প্রয়োগ করে তারা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর আমানতের ওপর সুদ-হারের প্রভাব এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতের ওপর 'পাস্ট ডিভিডেন্ট রেট'-এর প্রভাব দেখিয়েছেন। তারা আরো দেখান যে, মুসলিম গ্রাহকদের বেলায় প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সুদের হারের সঙ্গে সুদমুক্ত ব্যাংকের প্রস্তাবিত মুনাফার হারের মধ্যে একটি নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

বেলি এবং কুহেন (২০০৩) বিশ্ববিদ্যালয়পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কিত ধারণা ও বিভিন্ন আর্থিক পরিভাষার মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এতে দেখা যায়, ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষা থেকে প্রচলিত ব্যাংকিং পরিভাষা সংখ্যা অনেক বেশি। এতে আরো উল্লেখ করা হয়, ইসলামী ব্যাংকিং সেবাগুলোর দক্ষতা বিচারের একমাত্র উৎস ধর্মীয় নিষ্ঠা নয়। এতে সুপারিশ করা হয় যে, ইসলামী পণ্য সম্পর্কিত জানাশোনা জোরদারের জন্য শিক্ষা হতে হবে প্রচলিত পণ্যের সমতুল্য। এতে ভোক্তারা আরো ভালোভাবে তাদের পছন্দের পণ্য বেছে নিতে পারবেন। ভিভেরিতা (২০১১) উল্লেখ করেন যে, ইসলামী

ব্যাংকগুলো অত্যন্ত মূল্যসাশ্রয়ী, প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে ৫% বেশি এবং দেখান যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় অধিক মুনাফা ও রেভিনিউ সৃষ্টি করে।

ইকবালের (১৯৯৭) মতে, ঋণ অর্থায়ন বিলোপ এবং জোরালো বণ্টন দক্ষতার ফলে ইসলামী অর্থায়ন অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং তা বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আর্থিক তৎপরতার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র সৃষ্টি করে। তাই ডায়াগনস্টিক মডেলগুলোতে দেখা যায়, লায়াবিলিটিজ স্ট্রাকচারের (liabilities structure) ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা স্থিতিশীল এবং লাভ বণ্টনের মাধ্যমে আনুপাতিক হারে সম্পদের সুসমন্বয় ঘটে। এখানে স্থির সুদের পেছনে ব্যয় এবং ঋণের মাধ্যমে পুনঃ অর্থায়নের সুযোগ নেই (নেদাল, ২০১১)।

সুদিব্যবস্থার চেয়ে লাভ ভাগাভাগির ধারণা তুলনামূলক স্থিতিশীল। চাপরা (১৯৯২), কাহফ (১৯৯৮), সিদ্দিকী (২০০২) এবং জারকা (২০০৩) সবাই এ বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। এই ব্যবস্থা মুনাফার হারের ওঠানামা প্রতিরোধ করে। এমন অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো সুদভিত্তিক ঋণ অর্থায়ন।

সামাদ ও হাসান (১৯৯৭) এ বিষয়ে আরো গবেষণা করেন। তাদের বরাত দিয়ে নেদাল (২০১১) উল্লেখ করেন, বেশ কিছু প্রচলিত ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের তুলনা করে দেখা যায় প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংক কম ঝুঁকিপূর্ণ। অন্য দিকে, সরকার (২০০০) এবং সামাদ ও হাসান (১৯৯৭) এই উপসংহারে পৌছেন যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোকে যুৎসই ব্যাংকিং আইন ও বিধি দ্বারা শক্তিশালী করা গেলে এগুলো থেকে কার্যকর ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে এবং তা অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

কাদের ও আসারপোতা (২০০৭) সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ব্যাংকগুলোর পারফরমেন্স বিচারের জন্য ব্যাংকপর্যায়ের উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন। গবেষণার জন্য ৩টি ইসলামী ব্যাংক ও পাঁচটি প্রচলিত ব্যাংকের ২০০০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ব্যালান্স শিট ও ইনকাম স্টেটমেন্ট নেয়া হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোর পারফরম্যান্স বিচারের জন্য লাভজনকতা, তারল্য, ঝুঁকি ও সচ্ছলতা এবং এফিশিয়েন্সি ফিনান্সিয়াল রেশিও প্রয়োগ করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ইউএইর ইসলামী ব্যাংকগুলো সেখানকার প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় অধিক লাভজনক, স্বল্প লিকুইড, স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ এবং অধিক দক্ষ। গবেষকেরা উপসংহারে বলেন যে তাদের গবেষণা থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অনুমিতি (inference) পাওয়া যায় : প্রথমত, ইউএইর ইসলামী ব্যাংকগুলোর দ্রুত প্রবৃদ্ধির মূল কারণ : ইসলামের লাভ-লোকসান ভাগাভাগি ব্যবস্থা; দ্বিতীয়ত, ইউএইর ইসলামী ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধান ও বিধিবিধান প্রচলিত ব্যাংকগুলো থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত। কারণ, ইসলামী ব্যাংকের কাঠামো প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে ভিন্ন।

সামাদ ও হাসান (২০০০) ১৯৮৪-১৯৯৭ এবং ১৯৯০-১৯৯৭ এই দুই মেয়াদে মালয়েশিয়ার একটি ইসলামী ব্যাংকের (ব্যাংক ইসলামিক মালয়েশিয়া বেরহাদ-বিআইএমবি) লাভজনকতা,

তারল্য, ঝুঁকি ও সচ্ছলতা এবং কমিউনিটি ইনভলভমেন্টের ক্ষেত্রে ইন্টার-টেমপোরাল ও ইন্টার-ব্যাংক পারফরম্যান্স বিচার করেন। এই গবেষণায় বিআইএমবিকে ১০টি প্রচলিত ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যেখানে পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয় ফিনান্সিয়াল রেশিও; এগুলোর গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য এফ-টেস্ট এবং টি-টেস্ট করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বিআইবিএম ১৯৮৪-১৯৯৭ মেয়াদে লাভজনকতার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করে। গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় বিআইএমবি তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং অধিক সচ্ছল।

৬. উপসংহার

এই নিবন্ধে ইসলামী অর্থায়ন, এর বৈশিষ্ট্য এবং বৈশ্বিক বাজারে এর গুরুত্ব পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের জন্য শরী'আহ্ বিধান মেনে ইসলামিক ফিনান্সিয়াল মার্কেটে অংশগ্রহণের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইসলামী অর্থায়ন বাজারের উত্থান ব্যাপকভাবে শরী'আহ্সম্মত পণ্য জোগান দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বিপুল সুফল বয়ে এনেছে।

অনুবাদ : তালহা বিন নোমান

তথ্যসূত্র

ব্লে, জে. এবং কুহেন, কে. (২০০৩), Conventional Versus Islamic Finance: Student Knowledge and Perception in the United Arab Emirates, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ৫(৪): ১৭-৩০।

চাপড়া, এম. (১৯৯২), The Role of Islamic Banks in Non-Muslim Countries, দি জার্নাল অব মুসলিম মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স, ১৩(২):১-১৭।

চাপড়া, এম.ইউ. (২০০১), Islamic Banking and Finance: The Dream and the Reality, জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, ১৮(২): ৭-৩৯।

দার, এইচ. (২০০৩), হ্যান্ডবুক অব ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং, চ্যালটেনহ্যাম, এ্যাডওয়ার্ড এলগার পাবলিশিং লিঃ।

হানিফ, এম. (২০১১), Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বিজনেস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্স, ২(২), ১৬৮-১৭২।

হ্যারন, ডি.এস. এবং **আহমদ, এন.** (২০০০), The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ১(৪), ১-৭।

হোসেইন, এ., জামির, আই., ক্রিশেন, এন. এবং **আব্বাস, এম.** (২০১১), The Islamic Financial System Alternative. http://www.worldfinancialreview.com/?p=533, ১৬ মার্চ ২০১৪ নেয়া হয়েছে।

ইব্রাহিম, এস.এইচ.এম. (২০০০), The Western Philosophical Assumptions Underlying Conventional (Anglo-American) Accounting, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ২(২), ১৯-৩৮।

ইকবাল, জেড. (১৯৯৭), Islamic Financial Systems, ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, ৪২-৪৫।

কাদের, জে.এম. এবং **আসারপোতা এ.কে.** (২০০৭), Comparative Financial Performance of Islamic vis a vis Conventional Banks in the UAE, ইউএই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-২০০৭ সালে স্টুডেন্ট রিসার্চ সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপিত নিবন্ধ।

কাহফ, এম. (১৯৯৮), Islamic Banks at the Threshold of the Third Millennium, সৌদি আরব, আইআরটিআই।

কালিম, এ. এবং **ইসা, এম.এম.** (২০০৩), Casual Relationship Between Islamic and Conventional Banking Instruments in Malaysia, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ৪(৪), ২-৪।

কায়অং, পি.আর., সু, জেড.পি. এবং **নাম, ডি.ডব্লিউ.** (২০১২), A Comparative Study between the Islamic and Conventional Banking Systems and Its Implications, জার্নাল অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ২(৫), ৪৮-৫৪।

মইন, এম.এস. (২০০৮), Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakistan: A Comparative Study, University of Skovde-এর স্কুল অব টেকনলজি অ্যান্ড সোসাইটিতে উপস্থাপিত মাস্টার ডিগ্রি প্রজেক্ট।

নেদাল, ইজি. (২০১১), Islamic Banking's Role in Economic Development: Future Outlook Centre of Islamic Finance, বাহরাইন, বাহরাইন ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স।

রাজেশ, কে., আগারওয়াল এবং **ইউসেফ, টি.** (২০০০), Islamic Banks and Investment Financing, জার্নাল অব মানি, ক্রেডিট অ্যান্ড ব্যাংকিং, ৩২(১), ৯৩-১২০।

সামাদ, এ. এবং **হাসান, কে.** (২০০০), The performance of Malaysian Islamic Bank During 1984 – 1997: An exploratory study, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ১(৩), ১-১৪।

সামাদ, এ. (২০০৪), Performance of Interest-free Islamic banks vis-à-vis Interest-based Conventional Banks of Bahrain, আইআইইউএম জার্নাল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ১২(২), ১-১৫।

সরকার, এ. (২০০০), Islamic Banking in Bangladesh, Performance problems and prospects, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ১(৩)।

সিদ্দিকী, এম.এন. (২০০০), The Comparative Advantages of Islamic Banking and Finance, সেন্টার ফর মিডিল ইস্টার্ন স্টাডিজ, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, পৃঃ ১৮৩-১৮৮।

সিদ্দিকী, এম. (২০০২), *Comparative Advantages of Islamic Banking and Finance, http://www.siddiqi.com/mns/Advantages.html*, ১১ এপ্রিল, ২০১৪ নেয়া হয়েছে।

সিরাইরি, এস.এ. (২০১০), *Cost and Profit Efficiency of Conventional and Islamic Banks in GCC Countries*, জার্নাল অব প্রোডাক্টিভিটি অ্যানালাইসিস, ৩৪(১), ৪৫-৬২।

তাহির, এস. (২০০৩), *Current Issues in the Practice of Islamic Banking. http://www.sbp.org.pk/departments/ibd/Lecture_8_Related_Reading_1.pdf*, ২২ মার্চ ২০১৪ নেয়া।

ওসমানী, টি.এস. (২০০২), *An Introduction to Islamic Finance*, করাচি, মাকতুবা মারিফুল কুরআন।

ভিভেরা (২০১১), *Performance Analysis of Indonesian Islamic and Conventional Banks. hhtp://ssrn.com/abstract=1868938 dated 22.09.2011*, ২২ মার্চ ২০১৪ নেয়া।

জাইনুল, জেড. এবং **কাসিম, এস. এইচ.** (২০১০), *An Analysis of Islamic Banks' Exposure to Rate of Return Risk*, জার্নাল অব ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ৩১(১), ৫৯-৮৪।

জারকা, এম. (২০০৩), *Islamization of Economics: The Concept and Methodology*, জার্নাল অব কেএইউ: ইসলামিক ইকোনমিকস, ১৬(১), ৩-৪২।

ইসলামী অর্থায়নে রিবা ও ঘারার

ক্যামিলে পালদি[১]

সারমর্ম

ইসলামে রিবা (সুদ) ও ঘারার (অনিশ্চয়তা) নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে আল-কুরআন ও সুন্নাহয় অসংখ্য দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে। সুদ প্রকৃতপক্ষে অনিশ্চয়তারই একটি প্রকার। যা ফটকাবাজি, নিষ্ঠুরতা, লোভ, অনৈতিকতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের দুয়ার খুলে দেয়। রিবা ও ঘারার উভয়েই মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, অবিশ্বাস, অস্থিরতা ও অবক্ষয় সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। শরী'আহ্য় (ইসলামী আইন) রিবা ও ঘারার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে এগুলো দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশি। তবে ক্ষতির চেয়ে সুফল বেশি হলে ঘারার গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

ভূমিকা

ইসলাম ব্যবসা ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে পণ্য, পণ্যের বিনিময়ে পণ্য কেনাবেচার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে অর্থ কেনাবেচার অনুমতি দেয়নি। কারণ এর ফলে রিবা সৃষ্টি হয়। রিবা প্রকৃতপক্ষে অনিশ্চয়তার একটি ধরন। রিবা ও ঘারার দুটিই শরী'আহ্য় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এগুলো দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়। তবে ঘারার (অনিশ্চয়তা) তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যখন অসুবিধার চেয়ে সুবিধা বেশি হয়।

রিবা

শরী'আহ্ তখনই কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনের অনুমতি দেয় যখন বিক্রয়চুক্তিকালে দুটি বিনিময়মূল্য (counter-value) হাতবদল হয় অথবা চুক্তিকালে একটি এবং ভবিষ্যতে একটি বিনিময়মূল্য লেনদেন হয়। কিন্তু উভয় বিনিময়মূল্য ভবিষ্যতে লেনদেন হবে বলে চুক্তি করা হলে তার অনুমতি নেই। কারণ, তা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। তবে এমন লেনদেনে ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি হলে তা অনুমোদনযোগ্য।

সুদভিত্তিক অর্থায়নব্যবস্থায় একটি বিনিময়মূল্য তথা ঋণের সুদ নিশ্চিত এবং অন্য বিনিময়মূল্য তথা ঋণগ্রহণকারীর বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় অনিশ্চিত। তাই সুদি ব্যবস্থা 'ঘারার'

---

১ **ক্যামিলে পালদি** (Camille Paldi), এফএএআইএফ লিমিটেড এবং ইভেন্টস জেএলটি'র প্রধান নির্বাহী। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী অর্থায়ন বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট এবং ইউরোপীয় ও চীনা আইনব্যবস্থার ওপর বিশেষজ্ঞ। তিনি 'ফ্রাঙ্কো-আমেরিকান অ্যালায়েন্স ফর ইসলামিক ফিন্যান্স' এবং ilovetheuae.com-এর প্রতিষ্ঠাতা।

(অনিশ্চয়তা)-এর একটি চরম অবস্থা। তাই শরী'আহ্ মতে তা নিষিদ্ধ। এতে সুফলের চেয়ে কুফল বেশি হয়।

সাদাল্লাহ বলেন, সুদের ক্ষেত্রে "দুটি বিনিময়মূল্যে নিশ্চয়তার ভিন্নতা হচ্ছে, লাভ থাকে একজনের হাতে, লাভের মূল্য বর্তায় অন্যজনের ওপর। এই ঋণের মূল কথা হচ্ছে, অন্যের ওপর সুদ চাপিয়ে দিয়ে অবিচার সৃষ্টি করা" (২০০৯:১১১)।

সুদভিত্তিক অর্থায়নের একটি প্রতিরূপ হলো ঋণ অর্থায়ন। এতে শরী'আহ্'র আবশ্যিক শর্তগুলো পূরণ হয় না।

দুসুকি বলেন : "কোনো চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য বিনিময়মূল্য (অ্যাওয়াজ) উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। বিনিময়মূল্যের তিনটি উপাদান : ঝুঁকির (আরবি : ঘরম) উপস্থিতি, শ্রম ও প্রচেষ্টা (ইখতিয়ার) এবং দায়বদ্ধতা (দামান)। বেশির ভাগ ঋণ অর্থায়ন চুক্তিতে অ্যাওয়াজ-এর এক বা একাধিক উপাদান অনুপস্থিত থাকে। কোনো চুক্তিতে ঝুঁকি, সামর্থ্য ও দায়বদ্ধতার উপাদানগুলো না থাকলে তাকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না" (২০১১:৩)।

রিধা সাদাল্লাহ বলেন, কুরআনে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার অনেক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে : "শুরুতেই অবিচার; যেহেতু ঋণের মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত শুরুতেই বেধে দেয়া হয়" (২০০৯:১১১)। ইসলাম অর্থের সময়মূল্য (time value) সমর্থন করে না। কারণ, বিনিময়ের ক্ষেত্রে সময় কখনো বাড়তি অর্থ দাবির একমাত্র বিবেচ্য হতে পারে না। তাই সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দাবি করা যাবে না। সাদাল্লাহ বলেন, সময় নয় বরং অতিরিক্ত দাবি করার ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই কোনো পণ্য বা সম্পদ হতে হবে। নইলে তা টাকার পরিবর্তে টাকা লেনদেন হয়ে যায়।

আল্লামা তকি উসমানী ব্যাখ্যা করেন, "মূল্য পরিশোধের সময়টি কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণের আনুষঙ্গিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু এটা টাকার জন্য টাকা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাড়তি দাবির একমাত্র ভিত্তি ও একক বিবেচনা হতে পারে না" (২০০০:১০)। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য, টাকার বিনিময়ে পণ্য বৈধ। কিন্তু টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন হলে তা 'রিবা' হিসেবে গণ্য হবে। সুদি অর্থায়নের ফলে একটি মেকি অর্থনীতি (false economy) জন্ম নেয় যা অস্থিরতা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং ধারাবাহিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা হচ্ছে সম্পদভিত্তিক; যা প্রকৃত অর্থনীতি, বাস্তব সম্পদ ও উদ্ভাবন সৃষ্টি করে এবং স্থিতিশীলতা জোরদারের মাধ্যমে এমন এক অর্থনীতি গড়ে তোলে যেখানে ফটকাবাজ ও ব্যাংকাররা তাদের লোভী ও বেপরোয়া আচরণ দ্বারা মুনাফার জন্য বাজার কুক্ষিগত করতে পারে না।

তকি উসমানীর মতে, "সুদভিত্তিক অর্থায়ন সত্যিকারের সম্পদ সৃষ্টি করে না; তাই অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান যে ঋণ দেয় তার সঙ্গে সমাজে উৎপাদিত বাস্তব পণ্য ও সেবার মিল থাকে না। কারণ সমপরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি না করেই সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয় এবং কখনো কখনো কয়েক

গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়” (২০১১:১০)। উসমানী ব্যাখ্যা করে বলেন, “অর্থ সরবরাহ ও বাস্তব সম্পদের উৎপাদন এই দুয়ের ব্যবধান থেকে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি হয়” (২০১১:১০)। তিনি আরো বলেন, “ইসলামী ব্যবস্থায় অর্থায়নকে যেহেতু সম্পদ সমর্থিত হতে হয়, তাই সর্বদা তা সম্পদ ও সেবার সঙ্গে মিল রেখে এগিয়ে যায়।”

সুদভিত্তিক ঋণব্যবস্থায় মহাজন একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা লাভ করে। তার কাছ থেকে ঋণ নেয়া প্রতিষ্ঠানটি লাভ করেছে নাকি লোকসান গুনেছে, তাতে তার কিছু যায়-আসে না। প্রতিষ্ঠানটি যদি বিপুল অঙ্কের মুনাফা করে তখনো মহাজন নির্দিষ্ট হারে ফেরত পায়। এখানে ন্যায়সঙ্গত হতো মহাজন যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বল্প হারে সুদ না নিয়ে লাভ ভাগাভাগি করে নিত। প্রতিষ্ঠানটি লোকসান গুনলেও মহাজন নির্দিষ্ট হারে ফেরত পান। ঋণগ্রহীতাকে পুরো ক্ষতি বহন করতে হয়। কিন্তু ন্যায্য হতো মহাজন যদি অস্বাভাবিক উচ্চহারে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ না নিয়ে ব্যবসা উদ্যোগের ক্ষতিতে ভাগিদার হতো। রিবা (সুদ) এমন এক অর্থায়নব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে যেখানে ঝুঁকির বেশির ভাগ বহন করে ঋণগ্রহীতা; আর লাভের বেশির ভাগ যায় ঋণদাতার ভাগে।

শেখ ওয়াহবা জুহাইলির মতে, “রিবা হচ্ছে উদ্বৃত্ত পণ্য, সম্পদের জন্য সম্পদের বিনিময় লেনদেনে যার কোনো বিনিময়মূল্য নেই” (২০০৬:২৫)। এই লেনদেনের অভিপ্রায় হলো একটি উদ্বৃত্ত পণ্য। সুদের সংজ্ঞায় নগদ সুদ ও অবৈধ বিক্রি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু, যেকোনো একটিতে বিমুক্তি স্থগিতকরণ হলো উপলব্ধিমূলক বস্তুগত প্রতিদান ছাড়াই একটি বৈধ উদ্বৃত্ত, তাই ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির কারণে সাধারণত বিলম্ব ঘটে। ইসলাম টাকার জন্য টাকা বিনিময় এবং টাকার সময়মূল্য ধারণা অনুমোদন করে না।

তকি উসমানী বলেন, “যেখানে লেনদেনের পণ্য হয় অর্থ, সেখানে বিলম্বে পরিশোধ করার কারণে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করাই হচ্ছে রিবা” (২০১১-১০)। অনুরূপভাবে, “ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে (টাকার বিনিময়ে টাকা) বাড়তি দাবি করাও রিবা। এই দাবির বিপরীতে সময় ছাড়া আর কিছু নেই” (উসমানী, ২০১১:১০)।

ইসলামে দুই ধরনের রিবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ধার (credit) এবং উদ্বৃত্ত (surplus) রিবা। বকেয়া ঋণ বিলম্বে পরিশোধের জন্য প্রথম ধরনের রিবা সৃষ্টি হয়; এখানে ধার হতে পারে বিক্রিত পণ্য বা কোনো ঋণ (জুহাইলি, ২০০৬:২৬)।

তাই “কোনো বিনিময়মূল্য ছাড়াই বিনিময় করা দুটি পণ্যের যেকোনো একটিতে বৃদ্ধির ঘটনা ঘটলে ‘ধার রিবা’ সৃষ্টি হয় (জুহাইলি, ২০০৬:২৮)। সমপরিমাণ বিনিময় অনুমোদিত নয়, কারণ এখানে মূল্য বৃদ্ধির ঘটনা ঘটতে পারে। জুহাইলি বলেন, মূল্যবৃদ্ধির ফলে কিছু লাভ না হলে চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষই সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ স্থগিত করতে রাজি হবে না (জুহাইলি, ২০০৬:২৮)। কোনো লেনদেনের এক বা উভয় ‘বিনিময়মূল্য’ (counter-value) ভবিষ্যতের

কোনো সময়ের জন্য (একই ধরনের পণ্য) স্থগিত রাখা হলে 'হাতে হাতে' নীতি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। ফলে ঋণের সুদ সৃষ্টি হয়। বিনিময়মূল্য সমান হবে এমন কথা থাকলেও ভবিষ্যতে পণ্য বিক্রির চুক্তিও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এর ফলে বিলম্বিত রিবা বা ধার রিবা সৃষ্টি হয় (আহমেদ, ২০১১:৩২)।

উবায়দা বিন আল-সিমিত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের পরিবর্তে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর ও লবণের পরিবর্তে লবণ, একই জাতীয় পণ্যের সঙ্গে ওই পণ্য, সমানে সমান হতে হবে এবং মূল্য হাতে হাতে বিনিময় করতে হবে। কোনো একটি ভিন্নতর হলে নগদ বিনিময় মূল্যে বিক্রি করো (মুসলিম, কিতাব ১০, নং ৩৮৫৩) (বিসার, ২০০৯:৩৪)।

হাদিসে বর্ণিত ছয়টি পণ্য হলো 'রিবায়ি পণ্য'। এখানে সমজাতীয়তার নীতি ভঙ্গ করা হলে তা অতিরিক্ত রিবা (রিবা আল-ফাদল) বা উদ্বৃত্ত রিবা হিসেবে গণ্য হবে। আর 'হাতে হাতে' (তথা তাৎক্ষণিক লেনদেন) শর্ত পূরণ না হলে তা বিলম্বিত রিবা (রিবা আল-নাসিয়াহ) বা 'ঋণের রিবা' হিসেবে গণ্য হবে (আহমেদ, ২০০১১:৩১)। এ ছাড়া সে যুগে 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ' এবং 'রুপার বিনিময়ে রুপা' আর্থিক লেনদেনের (সার্ফ) ভূমিকা পালন করত (আহমেদ, ২০১১:৩১)। যদি একই জাতীয় রিবায়ি পণ্যের লেনদেন হয়, তাহলে তা হতে হবে একই স্থানে এবং সমপরিমাণে (আহমেদ ২০১১:৩১)। যদি বিনিময়কৃত পণ্যের পরিমাণে পার্থক্য থাকে তাহলে একই স্থানে বিনিময় করা হলেও তা অতিরিক্ত রিবা (রিবা আল-ফাদল) বা উদ্বৃত্ত রিবা হিসেবে গণ্য হবে (আহমেদ ২০১১:৩১)। অতিরিক্ত রিবার বিধি ভিন্ন মানের একই জাতীয় পণ্য ভিন্ন পরিমাণে বিনিময়কেও নিষিদ্ধ করেছে (যেমন– ভালো মানের খেজুরের সঙ্গে খারাপ মানের খেজুর বিনিময় রিবার অন্তর্ভুক্ত হবে) (আহমদ ২০১১:৩১)।

ভিসারের মতে, দুটি নিম্নমানের খেজুরের সঙ্গে একটি ভালো মানের খেজুর বিনিময়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে অর্থের বিনিময়ে নিম্নমানের খেজুর বিক্রি এবং সেই অর্থ দিয়ে ভালোটি কেনার অনুমতি রয়েছে (২০০৯:৩৫)। জুহাইলি বলেন, "উদ্বৃত্ত সুদ হচ্ছে ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ ছয়টি পণ্য যেমন– সোনা, রুপা, গম, যব, লবণ ও শুকনো খেজুরের মধ্যে একই ধরনের জিনিস ভিন্ন পরিমাণে বিক্রি (২০০৬:২৬)। এটা সমজাতীয় পণ্যের তাৎক্ষণিক লেনদেনে 'সমানে সমান' নীতির লঙ্ঘন।

জুহাইলি ব্যাখ্যা করে বলেন, "এ ধরনের রিবা নিষিদ্ধের কারণ, এটা যেন 'ঋণের রিবা'র অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত না হয়। যেমন– কোনো লোক বাকিতে স্বর্ণ বিক্রি করল। তাকে ক্রেতা রুপায় মূল্য পরিশোধ করে স্বর্ণের পরিমাণের চেয়ে বেশি দিলো (২০০৬:২৬)। একজাতীয় পণ্য অন্যজাতীয় পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করলে তা রিবা হবে না (যেমন– উচ্চ মানের খেজুরের সঙ্গে গম বা রুপা এবং এরপর গম বা রুপার সঙ্গে নিম্নমানের খেজুর) (আহমেদ, ২০১১:৩২)।

আবু সাইদ আল-খুদরি (রা.) এবং আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রাসূল (সা.) এক ব্যক্তিকে খাইবার অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি আল্লাহর রাসুলের জন্য (খাইবার থেকে) খুব ভালো মানের খেজুর নিয়ে আসেন। তখন রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, খাইবারের সব খেজুরই কি এমন উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম, তা নয়। হে আল্লাহর রাসূল আমরা এই মানের একছা খেজুরের সাথে আমাদের দুই ছা খেজুর বিনিময় করেছি এবং এর দুই ছা-এর বিনিময়ে আমাদের তিন ছা বিনিময় করেছি। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমরা এ রকম করবে না (কারণ, এটা এক ধরনের ইউজারি), উভয়কে একত্রে মিশিয়ে (নিম্নমানের সঙ্গে) টাকার বিনিময়ে বিক্রি করো এবং এরপর সেই টাকা দিয়ে ভালো মানের খেজুর কিনে নাও (বুখারী, খণ্ড ৩, বই ৩৪, নং ৪০৫; আরো দেখুন, মুসলিম, বই ১০, নং ৩৮৭৫) (ভিসার ২০০৯:৩৪)।

হানাফি ও হাম্বলি মাজহাবের ইমামদের মতে, বিভিন্ন পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য বিনিময় নিষিদ্ধ করার আইনগত কারণ হলো ওজন এবং আয়তন; ইমাম মালিকের মতে, এর পুষ্টিমান এবং সংরক্ষণযোগ্যতা; এবং ইমাম শাফীর মতে, সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার নিছক কারণ হচ্ছে তা খাদ্যবস্তু (জুহাইলি, ২০০৬:৩৯)।

ঘারার

আরবি শব্দ 'ঘাররা' থেকে 'ঘারার' (অনিশ্চয়তা) পরিভাষার উৎপত্তি। যার অর্থ ছলনা বা প্রতারণা করা। জুয়ার আরবি শব্দ হচ্ছে 'মাইসির' যা 'ইয়াস্‌সারা' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ দৈব সুযোগ বা বিনা পরিশ্রমে কোনো কিছু অর্জন (কামালি ২০০০:১৫১)। বিভিন্ন ধরনের 'ঘারার' রয়েছেঃ নিখাদ ফটকাবাজি, যেখানে সুযোগ বা জুয়ার ওপর ফলাফল নির্ভরশীল; অনিশ্চিত ফলাফল, যেখানে বিনিময়মূল্য অনিশ্চিত বা বাস্তবিক নয়; বস্তুর যথার্থতা নেই (inexactitude of object); এবং বস্তুর অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ। কামালির মতে, ফটকাবাজি হচ্ছে এমন প্রত্যাশায় কোনো সম্পদ কেনাবেচা যে, ওই সম্পদের মূল্য থেকে লাভ করার সুযোগ রয়েছে (২০০০:১৪৭)। এটা এক পক্ষ এবং সার্বিকভাবে গোটা মানবতার কল্যাণের বিনিময়ে অন্য পক্ষের বস্তুগত সুবিধা লাভের জন্য প্রতারণার সুযোগ সৃষ্টি করে।

কামালির মতে, আল-কুরআনে মাইসির নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, এখানে অস্পষ্ট ও অনৈতিক প্রলোভনের ভিত্তিতে দু'টি পক্ষের মধ্যে একটি নামেমাত্র চুক্তি হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে লাভের আশা দেয় (২০০০:১৫২)। জুয়াড়ি পক্ষগুলো একটি ঝুঁকি নেয় যা তাদের নিজস্ব সৃষ্টি। যেখানে প্রাপ্তির আশা ও হারানোর ভয় উভয়ই এমনভাবে থাকে যে সেগুলো আমাদের স্বাভাবিক জীবনের অপরিহার্য অংশ নয় (কামালি, ২০০০:১৫২)। কামালি ব্যাখ্যা করেন, কোনো বিক্রি-চুক্তিতে এক পক্ষ তার পাওনা পায় কিন্তু অন্য পক্ষ পায় না এবং দ্বিতীয় পক্ষ একধরনের ঝুঁকি (মুখারাত) গ্রহণ করছে যা তাকে উদ্বিগ্ন এবং

তার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে। তাহলে ওই কেনাবেচায় অংশ নেয়া দু'পক্ষই প্রতারণা (ঘারার) ও জুয়ায় অংশ নিচ্ছে বলে বিবেচিত হবে (২০০০:১৫৪)। চুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব (বস্তু, মূল্য, সরবরাহের সময়), বস্তুর অস্তিত্ব ও হস্তান্তরের সময় নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং এর ফলাফল সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির সঙ্গে ঘারারকে সম্পর্কযুক্ত করা যেতে পারে।

চুক্তির এমন ঝুঁকি থেকে ঘারার (অনিশ্চয়তা) উদ্ভূত যা বিক্রির স্তম্ভ ও উদ্দেশ্যকে হালকা করে দেয়। আল-কারশি বলেন, ঘারার নিষিদ্ধের যৌক্তিক কারণ হচ্ছে বিক্রি সম্পন্ন করার অক্ষমতা, মানুষের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করাকে বাধা দেয়াসহ (আকল আল-মাল বিল-বাতিল) চুক্তির সততা এবং বিক্রিতে বিনিময়মূল্যের অসমতা এবং সম্ভাব্য মতবিরোধ ও ঘৃণা দূরীকরণ। কামালি ব্যাখ্যা করেন, তখনই অনিশ্চয়তার কারণ ঘটে যখন চুক্তির একটি পক্ষ তার প্রাপ্য পায় কিন্তু অন্য পক্ষ তার প্রাপ্য পায় না। যদি দ্বিতীয় পক্ষের অধিকার সর্বদা অপূর্ণ থাকে তাহলে প্রথম পক্ষ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস (আকল আল-মাল বিল-বাতিল) করার অপরাধে অপরাধী হয়। এ ধরনের অনিশ্চিত বিক্রি জুয়া এবং পন্টিং (punting) (আল-কিমার ওয়াল মাইসির)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। যা শরী'আহ্য় নিষিদ্ধ (২০০০:৯০)। 'তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না, কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ' (সূরা আল-নিসা, ৪:২৯)।

কামালি জোর দিয়ে বলেন, জুয়া বা কিমার হলো, চুক্তিবদ্ধ দুটি পক্ষের মধ্যে একটি লড়াকু সম্পর্ক। দুই পক্ষই লোকসানের ঝুঁকি নেয় এবং এক পক্ষের লোকসান মানে অন্য পক্ষের লাভ (২০০০:১৫১)। কামালি বলেন, এটা সম-অধিকার নীতির লঙ্ঘন এবং পারস্পিক চুক্তির ভিত্তিতে এক ধরনের ডাকাতি। এটা অনেকটা ডুয়েল লড়ার মতো; অর্থাৎ, চুক্তি করে একজনকে খুন করা (২০০০:১৫১)।

"জুয়াতেও সুযোগ গ্রহণের মতো একধরনের আবেদন রয়েছে এবং তা মানুষের জীবনের নৈতিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দেয়। এটি বস্তুগত লাভ এবং অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির প্রতি এমনভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করে যা অস্বাভাবিক আবেগপ্রবণ এবং তা মানুষকে এমনভাবে আবিষ্ট করে ফেলে যে তা জীবনের মূল্যবান তৎপরতার পেছনে ছোটার মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়" (কামালি, ২০০০:১৫১)।

কামালি ব্যাখ্যা করে বলেন, "জুয়া মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করে লড়াকু ও জয়ী হওয়ার মনোভাব সৃষ্টি করে। সভ্যতার জন্য যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ তার সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই। নৈতিকভাবে অস্বচ্ছ কর্মকাণ্ড এর বৈশিষ্ট্য। যা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার বীজ বপন করে। একই সঙ্গে সম্প্রীতি, আধ্যাত্মিক সচেতনতার পথে বাধা সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়" (২০০০:১৫১)। ঘারার নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য চারটি শর্ত পূরণ হতে হবে। ঘারার হতে হবে বড়, কারণ অর্থের পরিমাণ ক্ষুদ্র হলে তা কোনো চুক্তিকে বাতিল করে না; ঘারার অবশ্যই হবে একটি বিনিময় চুক্তি; ঘারার হবে চুক্তির

মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, এর সঙ্গে যুক্ত কিছুর সঙ্গে নয়; এবং জনস্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ঘারার অনুমোদিত।

কামালি বলেন, "ঘারার হলো একটি ব্যাপকভিত্তিক ধারণা এবং বিভিন্ন ধরনের লেনদেনে এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে (২০১১:৮৪)। উদাহরণস্বরূপ, একটি চুক্তির মধ্যেই প্রবল, মাঝারি ও দুর্বল ঘারার থাকতে পারে। বিভিন্ন ধারার মতবাদ ও পণ্ডিতদের মতে প্রতিটি ঘারারই বৈধ ও অবৈধ হতে পারে। মাওয়িল ইজ্জেদিন ব্যাখ্যা করে বলেন : "(ঘারার বিষয়ে) বিভিন্ন ধরনের চুক্তি পর্যালোচনা করে এর ওপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সহজাতভাবে যা ঘারার তা নিষিদ্ধ, যেমন– পরিমাপ করা যায় এমন কিছুর সঙ্গে পরিমাপ করা যায় না এমন কিছু বিনিময় মাকিল, নিষিদ্ধ, শুকনো খেজুরের সঙ্গে তাজা খেজুরের বিনিময় নিষিদ্ধ (২০০৪:৭৪)।

চুক্তির চেতনা ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও ঘারার (অনিশ্চয়তা) পরিলক্ষিত হতে পারে। চুক্তির চেতনায় তখনই ঘারার সৃষ্টি হয় যখন একটির মধ্যে দুটি বিক্রি থাকে। যেমন– ডাউন্ট-পেমেন্ট সেল (আরবুন) এবং কন্ডিশনাল সেল অথবা পেবল (pebble), টাচ (touch) বা টস (toss) সেল। যেখানে বিক্রি নির্ভর করে কোনো সম্পর্কহীন ঘটনার ওপর। স্থগিত (মুয়াল্লাক) বিক্রি, যেখানে বিক্রি সম্পন্ন হওয়া কোনো যদৃচ্ছ ঘটনার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। ভবিষ্যৎ বিক্রি, যেখানে বিনিময়মূল্যের জন্য ভবিষ্যতে সরবরাহের ঘটনা ঘটবে। এবং ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি বা বাই আল-কালি বি আল-কালি।

কামালি বলেন, পেবল, টাচ ও টস বিক্রির ক্ষেত্রে (আল-মুলাম্মাসা ওয়াল মুনাবাদা) যেমন– কোনো পশুর গর্ভে থাকা অবস্থায় তার বাচ্চা বিক্রি (হাবাল আল-হাবালা), অথবা ফল পাকার আগে তা বিক্রি, অদৃশ্য কিছু বিক্রি, অজানা কিছু বিক্রি (বাই আলমাদুম ওয়াল-মাজহুল) এবং এমন কিছু বিক্রি যা বিক্রেতা সরবরাহ করতে পারে না– এগুলো নিষিদ্ধ। কারণ এখানে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার মতো ঝুঁকি থেকে যায় (২০০০:৯০)। আরবুন বিক্রি হলো এমন বিক্রি যেখানে ক্রেতা দামের কিছু অংশ বিক্রেতার কাছে আগাম জমা রাখে। কিন্তু, শর্ত থাকে যে ক্রেতা যদি চুক্তি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় তাহলে বিক্রেতা আগাম জমার অর্থ বাজেয়াপ্ত করবে এবং সে তা নিয়ে নেবে (কামালি, ২০০০:৯০)।

প্রশ্ন আসতে পারে যে, উপরি উক্ত সবগুলো প্রক্রিয়াতেই অবৈধভাবে সম্পদ আত্মসাতের বিষয়টি জড়িত কি না এবং যদি তা-ই হয় তাহলে বিক্রিটি অবৈধ। এ ধরনের লেনদেন জুয়া হিসেবে বিবেচিত হবে (কামালি, ২০০০:১৫৪)। চুক্তিকৃত বস্তু, বস্তুটির মধ্যে থাকতে পারে এমন বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞতা, বস্তুর ধরন অথবা গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ঘারার থাকতে পারে। বস্তুর ধরন, প্রজাতি, গুণ, বস্তুর পরিমাণ, বস্তুর নির্দিষ্ট পরিচয়, বিলম্বিত বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকতে পারে; বস্তু হস্তান্তরে অক্ষমতা; অস্তিত্বহীন কোনো বস্তুর সঙ্গে সংযুক্তি এবং বস্তুটি দেখতে না পাওয়া (আইয়ুব ২০০৭:৬০)।

এমনকি চুক্তির সকল শর্ত পূরণ হওয়ার পরও বস্তুটি দেখতে পেতে হবে। অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে এমন চারটি কারণ দেখিয়েছেন ইবনে কাইয়্যুম এবং সানহুরি: (১) বস্তুটি অঙ্কুরিত অবস্থায় রয়েছে কিন্তু পরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; (২) চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বস্তুটির অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু ভবিষ্যতে অবশ্যই অস্তিত্ব লাভ করবে; (৩) চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বস্তুটির অস্তিত্ব থাকে না, আবার ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভ করবে কি না তাও অনিশ্চিত; এবং (৪) চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না এবং ভবিষ্যতেও তা অস্তিত্ব লাভ করবে এমন আশাও নেই।

কামালির মতে, এই চার অবস্থার মধ্যে শেষ দুটিতে অনিশ্চয়তা অতিমাত্রায় এবং তা চুক্তিকে অবৈধ করে (২০০০:৯১)। কামালি ব্যাখ্যা করেন, "প্রথম দুটি ক্ষেত্রে ইবনে কাইয়্যুম এবং সানহুরি দু'জনেই মনে করেন যে ঘারার অতি নগণ্য। তাই, উভয় ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ (২০০০:৯১)। আইয়ুব বলেন, অনিশ্চয়তা এড়ানোর জন্য ইসলামী আইন যেসব ক্ষেত্রে বিক্রির ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে– (১) বৈধ লেনদেনের জন্য প্রয়োজন এমন জিনিস, যার কোন অস্তিত্ব নেই; (২) বস্তুর অস্তিত্ব আছে কিন্তু তা বিক্রেতার মালিকানায় নেই অথবা যার প্রাপ্তি সহজলভ্য হবে বলে আশা করা যায় না; (৩) এমন জিনিসের লেনদেন, যার সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধ অনিশ্চিত (২০০৭:৬০)। চুক্তির শর্ত এবং বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বস্তুর অনুপস্থিতি ঘারার সৃষ্টি করে।

শরী'আহ্ মতে, ঝুঁকি আলাদাভাবে বিক্রি করা যায় না, কারণ এটি সম্পদ নয়। মূল্য দিয়ে বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং এর অস্তিত্বহীনতার ক্ষতিপূরণ হয় না এবং আলাদাভাবে ঝুঁকির কোনো মূল্য নির্ধারণ ও তা বিক্রি করা যায় না। কিন্তু, ব্যবসাসংশ্লিষ্ট ঝুঁকির মূল্য নির্ধারণ করা যায় এবং বিক্রি করা যায় (যুথবদ্ধ ঝুঁকি)। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কামালি দেখান যে, পণ্য বাছাইয়ের স্বাধীনতা থাকলে বিক্রি বৈধ। যদিও বিনিময়মূল্যের একটিতে শুধু বরাদ্দের অধিকার অথবা কোনো সুবিধা, সেবা বা উজুফরাক্ত (মানফাহ) চুক্তির সময় যার কোনো সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা ও অস্তিত্ব থাকে না অথচ স্পর্শযোগ্য বস্তু বা মালের মতোই এটা কেনাবেচা করা যায়" (২০০৯:১৯৪)। অবশ্য এ নিয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং ইসলামী আইনি ব্যাখ্যার বিভিন্ন ধারার (মাযহাব) মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

কামালি আরো বলেন, "ইমাম শাফি ও হাম্বলি উজুফরাক্তকে সম্পদের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও মালিকী তা করেননি। কামালির মতে পছন্দমতো মূল্য অথবা কিস্তি সাধারণত নগদ অর্থে পরিশোধ করা হয়। এ ক্ষেত্রে মূল্যটি হলো সম্পদ (মাল) (২০০০:২০১)। বিক্রি চুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষ বিনিময়মূল্য, বিক্রী পণ্য এবং মূল্য পাবেন। একে 'কাব্‌দ' ও 'তাকাবুদ' বলা হয়। বিক্রেতা অবশ্যই পণ্য (তাসলিম) হস্তান্তর করবে এবং ক্রেতা তা অধিকারে নেবে (কাব্‌দ)। সালাম ও ইসতিসনার ক্ষেত্রে 'কাব্‌দ'-এর প্রয়োজনীয়তা বাদ দেয়া হয়েছে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে (কামালি, ২০০৯:১২২)।

ভিসারের মতে, "ঘারার নিষিদ্ধ করার অর্থ হলো, ব্যবসায়িক অংশীদাররা লেনদেনে প্রস্তাবিত সঠিক বিনিময়মূল্য সম্পর্কে অবহিত হবেন" (২০০৯:৪৫)। কামালি 'ঘারার'কে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো, বিক্রিতব্য বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত অনিশ্চয়তা অথবা এর প্রাপ্যতা, পরিমাণ সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা এবং সর্বশেষে, সমাপ্তিকাল ও সরবরাহের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা। ভিসার বলেন, অনিশ্চয়তা বা ঘারার এড়ানোর জন্য, "বিক্রির বস্তু এবং মূল্য উভয়ের অস্তিত্ব এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলো যে সরবরাহে সক্ষম তা নিশ্চিত করতে হবে; এবং পরিমাণ, মান ও ভবিষ্যতে সরবরাহের তারিখ সুনির্দিষ্ট করতে হবে (২০০৯:৪৫)। ভিসার আরো মনে করেন যে, "একজন বিক্রেতা/অর্থায়নকারী কোনো বস্তু বিক্রি বা ইজারা দেয়ার আগে তার মালিকানা লাভ করতে হবে, সুতরাং বস্তুটির অস্তিত্ব থাকতে হবে (২০০৯:৭৫)। কেউ কোনো জিনিস বিক্রির আগে তাকে বিক্রিতব্য জিনিসটির মালিক বা গঠনমূলক ভোগদখল (কাব্‌দ) করতে হবে।

ঘারার-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য চুক্তিগত জটিলতার সঙ্গে যুক্ত। একাধিক লেনদেন একটি চুক্তির আওতায় থাকতে পারবে না। তাই একই চুক্তিতে দুটি বিক্রির লেনদেন নিষিদ্ধ। এর উদাহরণ হিসেবে ভিসার উল্লেখ করেন, একটি বিক্রি এবং একটি ইজারা (লিজ) লেনদেন একই সঙ্গে একটি চুক্তিতে থাকতে পারবে না (২০০০:৭৫)। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ভিসার বলেন, মুসলিম আইনজ্ঞরা ঘারার-এর ওপর নিষেধাজ্ঞাকে বিনিময়ে ন্যায্যতা বা বাজারে ন্যায্যমূল্য বজায় রাখার নির্দেশ বলে মনে করেন (২০০৯:৪৭)। কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আগে উভয় পক্ষ বাজারমূল্যসহ সংশ্লিষ্ট সব তথ্য পুরোপুরি অবহিত হবেন (ভিসার, ২০০৯:৪৭)।

আইয়ুব বলেন : ঘারার এড়ানোর জন্য চুক্তিটির বিষয়বস্তু এবং লেনদেনে এর বিনিময়মূল্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত থাকবে; পণ্যটি অবশ্যই সংজ্ঞায়িত, চিহ্নিত এবং সরবরাহযোগ্য হতে হবে এবং তা চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোকে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে, গুণগত মান ও পরিমাণ অবশ্যই উল্লিখিত হতে হবে, একটি চুক্তিতে পক্ষগুলোর অধিকার ও দায়ের ব্যাপারে কোনো সংশয় বা অনিশ্চয়তা থাকতে পারবে না, পণ্যের প্রাপ্যতা, অস্তিত্ব এবং সরবরাহযোগ্যতার বিষয়ে কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলো পণ্যের সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন (২০০৭:৬১)। মাওইল ইজ্জেদিন বলেন : "এসব চুক্তি সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার কারণ প্রতারণার আশঙ্কা, যা বিনিময়কৃত পণ্যগুলোর মধ্যে একটির পরিমাণ না জানার কারণে ঘটতে পারে (২০০৪:৭৪)। ঘারার আর্থিক ব্যবস্থাকে একটি 'জিরো-সাম গেম'-এ পরিণত করে, যেখানে একজন লাভবান ও অন্যজন লোকসানের সম্মুখীন হয়।

তবে, ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি হবে এমন অবস্থায় ঘারার-এর অনুমতি রয়েছে। কামালি বলেন, "জনগণের জন্য প্রয়োজন বা তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য হলে ঘারার জায়েজ (২০১১:৮৪)। তাই অনিশ্চয়তার (ঘারার) উপাদান থাকলেও শরী'আহ্ সালাম (আগাম ক্রয়) এবং ইসতিসনা (ম্যানুফ্যাকচারার কন্ট্রাক্ট) বৈধ করেছে। কারণ, জনগণের জন্য এগুলো প্রয়োজন রয়েছে"

(২০১০:৮৫)। তবে, ঘারার-এর প্রায় সব কিছুই নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে কারণটি হলো তা অনৈতিকতার বিস্তার ঘটায়, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে, সামাজিক বিভেদের জন্ম দেয়, বাজারকে উদ্বায়ী (volatile) ও আর্থিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। এটি প্রতারণা এবং নিষ্ঠুর লোভের দুয়ার খুলে দেয়। ইবনে তাইমিয়ার মতে, জুয়ার শয়তান রিবার চেয়েও বড়। কারণ, জুয়ার মধ্যে দুটি শয়তান জড়িত– সম্পদের অবৈধ দখলদারিত্ব এবং একটি অবৈধ খেলায় অংশগ্রহণ। দু'টিই হারাম (কামালি, ২০০০:১৫১)।

উপসংহার

শরী'আহ্‌য় রিবা (সুদ) ও ঘারার (অনিশ্চিত) সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আজকের ইসলামী অর্থায়ন ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মকাণ্ডে রিবা (সুদ) ও ঘারার (অনিশ্চয়তা)-এর উপাদান যুক্ত করে চলেছে। এখনো তারা ইকুইটি অর্থায়নের বদলে ঋণ অর্থায়নের অনুশীলন করছে।

অনুবাদ : আশরাফুল ইসলাম

তথ্যসূত্র

আহমেদ, হাবিব (২০১১), Product Development in Islamic Banks, এডিনবার্গ, এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

আহমেদ, হাবিব (২০১২), A Different Perspective on the Financial Crisis, পেপারস অব ডায়ালগ, অ্যাজেনজিয়া ইতালিয়া, ১৮-১৯।

চাপড়া, মোহাম্মদ ওমর (২০০৮), The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah, লন্ডন, ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট।

চৌধুরী, মাসুদুল আলম (২০০৭), The Islamic World System, A Study in Polity-Market Interaction, সিঙ্গাপুর, ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিফিক পাবলিশিং কোং, পিটিই, লিঃ।

দিয়েন, মাউইল ইজ্জি (২০০৪), Islamic Law, From Historical Foundations to Contemporary Practice, ইন্ডিয়ানা, ইউনিভার্সিটি অব নটর ডেম প্রেস।

আসিরাফ ওয়াজিদি দুসুকি এবং **সাঈদ বুহেরাউয়া,** Objectives of the Shari'ah and Its Implications for Islamic Finance, আইএসআরএ রিসার্চ পেপার নং ২২/২০১১।

কামালি, মোহাম্মদ হাশিম (২০১১), Shari'ah Law: An Introduction, অক্সফোর্ড, ইংল্যান্ড, ওয়ান ওয়ার্ল্ড পাবলিকেশন্স।

কামালি, মোহাম্মদ হাশিম (২০০০), Islamic Commercial Law, ক্যামব্রিজ, ইসলামিক টেক্সট সোসাইটি।

সাদাল্লাহ, রিধা (২০০৯), Concept of Time in Islamic Economics, আইআরটিআই রিসার্চ পেপার, ৮১-১০২।

উসমানি, মুফতি তকি (২০০০), Introduction to Islamic Finance, দারুল উলুম, করাচি।

ভিসার, হ্যান্স (২০০৯), Islamic Finance Principles and Practice, এডওয়ার্ড এলগার, ইউকে।

ভিসার, হ্যান্স (২০০৬), Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return, লিডেন, ব্রিল।

আল-কুরআন।

জুহাইলি, শেখ ওয়াহবা (২০০৬), The Juridicial Meaning of Riba, in Interest in Islamic Economics, (পৃঃ ২৫-৫২), থমাস রুটলেজ, নিউ ইয়র্ক।